হায়নার দাঁত

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

হায়নার দাঁত

জীবনে ছোট ছোট তুচ্ছ ঘটনা দিয়েই বৃহৎ নাটকের শুরু হয়। মনীষীরা বলেন, একটি সুতোকে কেন্দ্র ক'রে যেমন মিশ্রীর কুঁদো দানা বাঁধে, নাটকও তেমনি একটি প্রধান ভাবকেন্দ্রে লক্ষ্য স্থির রেখে অল্পে অল্পে দানা বেঁধে উঠবে। সেই কেন্দ্রটি বা সুতোটি থাকে নাট্যকারের হাতে। জীবনেও তাই। তফাতের মধ্যে এর সুতোটা ধরে থাকেন ভগবান বা অদৃষ্টদেবতা—যা-ই বলুন না কেন, বিরাট একটা শক্তি—তাই সে নাটক আরও জমাট হয়ে ওঠে।

এমনটা আর কার জীবনে কতটা হয় কে জানে, নলিনাক্ষর জীবনে অন্ততঃ বার বারই ঘটছে।···তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা, সামান্য দু-একটা কথার টুক্‌রো দিয়েই শুরু। কিন্তু তার পর? কী বিপজ্জনক নাটকই না অভিনীত হ'তে থাকে!

সেদিনের কথাটা আজও মনে আছে ওর।

দুপুর বেলা আপিস যাচ্ছিল। দুটোয় পৌঁছবার কথা, আড়াইটেয় পৌঁছলেও দোষ নেই। খবরের কাগজটা বড় ঠিকই, তবে তার বৃহত্তর কর্মকাণ্ডর সঙ্গে ওর কোন যোগ নেই। অর্থাৎ খবর অনুবাদ করতে হয় না। এমনিতেই কাজ কম, পৃষ্ঠাসংখ্যা কমেছে অনেক, যা আছে তারও সবটাই মূল্যবান বিজ্ঞাপনে ভরে যায়; অসার সংবাদ দিয়ে ভরাতে হয় না। নলিনের কাজ কলম লেখা—এখন সম্প্রতি একটু প্রমোশন পেয়েছে। এক-আধ দিন সম্পাদকীয় লেখারও ভার পড়ে। দমকা এক-আধটা ফীচার লেখার হুকুম হয়—'বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া' কিংবা 'মৃতপ্রায় কাঁসার বাসনশিল্প'—এই ধরনের। তেমন দরকার পড়লে, বড়জোর 'কভারেজ' যাকে বলে সে ভারও নিতে হয়। তবে সে রকম দরকার মোট আড়াই পৃষ্ঠায় আর কত বা কতবার পড়ছে! তাই বার্তা বা সম্পাদকীয় বিভাগে কোন কর্মচারী কখন যাচ্ছে না যাচ্ছে তা নিয়ে কর্তারা মাথা ঘামান না।

গ্রীষ্মের কামড় বেশ চেপে বসেছে কলকাতায়। বাতাসে আগুনের হল্‌কা। রাস্তারও পীচে আর পাথরে খর রোদ পড়ে তার তাপ

বিকীর্ণ হচ্ছে চারদিকে, সে তাপ এই বাস পর্যন্ত এসে আরোহীদের মুখচোখ ঝলসে দিচ্ছে। বাস-এ বসে যেন আরও চিংড়ি-মাছ-ভাজা অবস্থা। এক-একবার নলিনাক্ষর মনে হচ্ছে নেমে বাকি পথটুকু হেঁটেই যায়—কিন্তু পথচারীদের মুখচোখের অবস্থা ও ঘামে ভেজা জামা দেখে সাহস হচ্ছে না।

রাস্তার দিকেই চেয়ে আছে, হঠাৎ চোখে পড়ল ছেলেটা। সুরেন বাঁড়ুয্যে রোডের মোড়, দুদিকের ট্রাফিককেই এখানে অন্তত: মিনিট পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করতে হয়। গরমে এই দাঁড়িয়ে থাকাটাই অসহ্য, আরও যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু উপায়ই বা কী। অন্যমনস্ক হবার জন্যেই বেশী ক'রে পথের দিকে মন দিয়েছিল নলিনাক্ষ। তাইতেই চোখে পড়ল—একটা খোঁড়া ছেলে এই দাঁড়িয়ে থাকা বাস-ট্যাক্সি-লরীর ফাঁকে ফাঁকে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছে। বছর তেরো-চোদ্দ বয়স হবে। নিতান্তই ছেলেমানুষ। এই বয়সেই কিন্তু দুর্গতির শেষ নেই যেন। খোঁড়া বললেও ঠিক বলা হয় না। একটা পা গোড়া থেকেই কাটা। তার ওপর ক্রাচও জোটে নি বেচারার। একটা লাঠির মতো জিনিসের ওপর ভর দিয়েই কতকটা লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। আর একটু কাছে এলে দেখল শুধু পা-ই নয়, ডান হাতের তিনটে আঙুলও কাটা। বাকি দুটো আঙুলে একটা ভাঙা য়্যালুমিনিয়ামের বাটি আটকে ধরে ভিক্ষে করছে।

ভারী মায়া হ'ল নলিনাক্ষর। কালো—মানে কুচকুচে সাঁওতালী রঙ নয়, শ্যামবর্ণ বলতে ঠিক যা বোঝায় তাই। কিন্তু কালো রঙেও সুন্দর হ'তে বাধে না; আমাদের দেশের মহাকবিরা ও পুরাণকাররা তা জানতেন, তাই আমাদের দুই মহানায়ক—সৌন্দর্যের প্রতীক রাম ও কৃষ্ণ—দু'জনেই কালো। এরও মুখখানি ভারী সুন্দর, লাবণ্যে ভরা। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, বড় টানাটানা দুটি চোখ, টিকলো নাক, সাজানো সাদা দাঁত (এই শ্রেণীর ভিখিরীদের এই বয়েসেই

বিড়ি খেয়ে দাঁতে ছোপ ধরে, এর তা ধরে নি)—এমন কি দুটি ঠোঁটের গঠনও ভারী সুঠাম। ভদ্রঘরের ছেলে হ'লে বহু মেয়ের মনে আগুন জ্বালাত।

কে জানে কাদের ছেলে। কী ক'রে এমন দুর্গতিই বা হ'ল ! এর কি আর কেউ নেই যে একে দেখে !

অবশ্য ঐ মুখখানা ছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্য নেই। যেমন আর পাঁচটা হয়—মার্কামারা ভিখিরী। ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি, একটা ছেঁড়া তালি-দেওয়া হাফ প্যাণ্ট—ওর অনুপাতে অনেক বেঁটে ভাঙা লাঠি একটা। বস্তুত লাঠিটা কোন কাজেই আসছে না—ঐ এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়েই চলছে। চারিদিকের দৈত্যাকার বাস ট্রাম গাড়ির ফাঁক দিয়ে এই ভাবে চলা। কোন্‌দিন মরবে ছেলেটা ! কষ্টই কি কম হচ্ছে, এই গরমে এই ভাবে লাফিয়ে চলা—দরদর ক'রে ঘামছে, মনে হচ্ছে কে বালতি ক'রে জল ঢেলে দিয়েছে সর্বাঙ্গে—

কাছে আসতে হাতে যা উঠল দিয়ে দিল নলিনাক্ষ। বোধ হয় সিকি আধুলি কিছু ছিল। ছেলেটার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে বাটি সুদ্ধ হাতটা কপালে ঠেকাল। তবে তার দাঁড়াবার সময় নেই তখন, এদিকে সবুজ বাতি জ্বলায় সব গাড়িই একসঙ্গে চলতে শুরু ক'রে দিয়েছে ; তাদেরও, আর অপেক্ষা করা কিংবা ঐ সব ভিখিরীরা ঠিক-মতো রাস্তা পার হ'তে পারছে কিনা সেদিকে নজর দেওয়া সম্ভব নয়। ভিখিরীও অসংখ্য, আর ঐ চলন্ত গাড়ির মধ্যেই তাদের জীবিকা উপার্জন করতে হবে। ছেলেটাও ঐ গাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে, আশ্চর্য কৌশলে চাপা পড়ার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে ঐ ভাবেই লাফাতে লাফাতে চলে গেল। নলিনাক্ষই বরং যেন নিঃশ্বাস রোধ ক'রে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল —ছেলেটা নিরাপদে পার হতে পারে কিনা।

ভয়টা একেবারে অমূলকও নয়। ওদিকের একটা বাস থেকে কে একজন পাঁচ নয়ার মতো—তিনও হ'তে পারে, এত দূর থেকে ঠিক দেখা সম্ভব নয়—ছুঁড়ল, বাটিতে না পড়ে সেটা

পড়ল রাস্তায়। একটা ঠোঁটকাটা গন্নাথ্যাঁদা ভিখিরী তীর-বেগে সেটা লক্ষ্য ক'রে আসছে, ছেলেটাও পয়সা ছাড়তে রাজী নয়। সে তার মধ্যেই লাঠিটা ফেলে একরকম হামাগুড়ি দিয়েই গিয়ে বাঁ হাতে পয়সাটা তুলে নিল। পিছন থেকে যে মিনি বাসটা আসছিল সে কোনমতে বেঁকে গিয়ে ওকে বাঁচাল বটে কিন্তু লাঠিটা বোধ হয় বাঁচল না। মড়মড় করে আওয়াজ হ'ল—ভেঙেই গেল খুব সম্ভব।

সেই এক মুহূর্তের 'টেনশ্যন' যাকে বলে—তারই জের হিসেবে বহুক্ষণ পর্যন্ত বুক ঢিবঢিব করতে লাগল নলিনাক্ষর।

আপিসে এসেও ছেলেটার মুখ আর ঐ কষ্টের, প্রাণসংশয়-করা উপার্জনের কথা ভুলতে পারল না নলিনাক্ষ। বরং নিজের নিরিবিলি ঠাণ্ডা ঘরে বসে—সারা তেতলাটাই ওদের 'বাতানুকুলিত', ঠাণ্ডা এবং আরামদায়ক—কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করতে লাগল ওর কথাটা মনে হয়ে।

কাছ কিছু ছিল না, মানে টেবিলে কোন নির্দেশ ছিল না। কাজে মন দিলে এই অস্বস্তির ভাবটা কেটে যাবে ভেবে বেরিয়ে পড়ল নলিনাক্ষ, সহযোগী সম্পাদক জয়ন্তবাবুই কাজ বিলি করেন, তাঁর সন্ধানে। তিনি হেসে সুসংবাদ দিলেন—'কাজ কিসৃস্যু নেই, সময়টা কাটিয়ে চলে যান, আর কি! ছ'পাতার কাগজ, সাড়ে তিন পাতা বিজ্ঞাপন। থাকে আড়াই পাতা, অন্তত ছুটো পাতা নিউজ না দিলে লোকে গাল দেবে যে।...চা খাবেন?'

তাঁর ঘর থেকে ফেরার পথেই নিউজের হলটা পড়ে। সেখানেও তখন কাজ কম, নিউজ আসতে থাকে সন্ধ্যার পর থেকে. তাই সবাই এক জায়গায় বসে আড্ডা দিচ্ছে। নলিনাক্ষর তখনই নিজের ঘরে যেতে ভাল লাগল না, সেও এসে সেখানেই একটা চেয়ার টেনে বসল।

কিন্তু বসতে বসতেই চোখে পড়ল ধীরেনের টেবিলে একখানা

ছবি পড়ে, ছবি আর বিজ্ঞাপনের 'ম্যাটার' একটু। ওরই কে পরিচিত লোক বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছে, টাকা আর 'ম্যাটার' ধীরেন বিজ্ঞাপন বিভাগে পাঠাচ্ছে—চিঠি দিয়ে।

অলস কৌতূহলেই ছবিটা তুলে নিল নলিনাক্ষ। সাত বছরের একটি মেয়ে হারিয়েছে, তার বাবা বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। ভারী সুন্দর ফুটফুটে দেখতে মেয়েটি, দেখলেই কেমন মমতা হয়। খবরের কাগজের ছাপায় অবশ্য এর কিছুই বোঝা যাবে না—কিন্তু ওর ভারী মন-কেমন করতে লাগল। আহা, যাদের মেয়ে তাদের না জানি কী অবস্থায় দিন কাটছে, এই মেয়ে হারিয়ে!

ওর মুখ দেখেই বোধ করি মনের ভাবটা বুঝতে পারল ধীরেন, বলল, 'ভারী মিষ্টি মেয়েটি, না?…কী যে হয়েছে আজকাল, দেখেছ পর পর কতগুলো নিরুদ্দেশ খবর বেরোল? আর এই এক এজ-গ্রুপ—ছ-সাত থেকে দশ বারো। ছেলে মেয়ে দুইই। আশ্চর্য, এত হারায় কী ক'রে।'

ভবেশ বলে উঠল, 'কী ক'রে আবার! আজকালকার ইরেসপনসিব্‌ল্ মা-বাপ। বিশেষ ক'রে মায়েরা। বেরুবে তো একেবারে বেহুঁশ—বিশেষ যদি বাজার করতে বেরোল তো কথাই নেই। শুধু যে শাড়ি কিনতে গেলেই পাগল হয় তাও নয় মশাই, আমি দেখেছি—যে কোন জিনিস কিনতে গেলেই ঐ রকম। ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়াও চাই—অথচ সেদিকে নজর রেখে বাজার করবে সে ক্যালিবার নেই।'

নলিনাক্ষ বলল, 'আচ্ছা, পুলিস কিছু করতে পারে না! মিসিং স্কোয়াড্ তো খুব ভাল কাজ করে শুনেছি—'

'সে তো একটু বড়, যারা পালায় তাদের ধরে,' ভবেশ বলল, 'এ হারানো, আর এইটুকু বাচ্ছা। তাও ধরে বৈকি।…সেই মনে আছে একটা বাচ্ছাকে চুরি ক'রে নিয়ে তার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বার ক'রে চোরাই হীরে পাচার করছিল—? সেটা খুব ধরেছিল কিন্তু।… এমনি তো বাচ্ছাদের ধরার কোন প্রশ্ন নেই, হারিয়ে যায় যারা—

পথেঘাটে কেউ দেখল তো থানায় জমা দিয়ে গেল। তা করে, দুধ খাওয়ায়, ভাত খাওয়ায়, অনেক সময় অফিসাররা বাড়ি নিয়ে যান, একটা কেস তো জানি, থানার সিপাইরা চাঁদা ক'রে মানুষ করছে।'

'সে তো দুগ্ধপোষ্য, দু-তিন বছরের ছেলেমেয়ে। এই এজ-গ্রুপের কেউ থানায় গেছে দেখেছেন? কৈ, আমার তো তেমন কোন খবর চোখে পড়ে নি।' ধীরেন উত্তর দিল।

সন্তুবাবু এতক্ষণ ওদিকে বসে কাগজ পড়ছিলেন, এখন নাকটা একবার জোরে রগড়ে নিয়ে (এটা ওঁর মুদ্রাদোষ) যেন হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'আচ্ছা, এই যে সব এত বিজ্ঞাপন দেয়—এতে কি কোন কাজ হয়? খুঁজে পায় কেউ? সে খবর তো কেউ দেয় না আর! য়্যাঁ?'

'হ্যাঁ! তুমিও যেমন। আবার এত পয়সা খরচ ক'রে সে কথা জানাতে যাচ্ছে—ওগো তোমরা সব শোন, বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার খুব কাজ হয়েছে—আমি বাচ্ছাকে খুঁজে পেয়েছি। কার উদ্বেগ দূর করার জন্যে করবে বলো! এত কার মাথাব্যথা। যা রেট হয়েছে তোমাদের কাগজে বিজ্ঞাপনের। কুনাল দত্ত তো আর মুফতে ছাপবে না!'

কে একজন ওদিক থেকে বলে উঠল, 'রেট এই রকম না হ'লে তোমাদের মতো গবেটদের এত মাইনে দিয়ে পুষত কী ক'রে? মাইনের রেটটাও মনে করো। এখন নিউজ ট্র্যানস্‌লেট করা সাবএডিটররা যা পাচ্ছে—শুনলে সেকালের নামকরা এডিটর—পাঁচকড়ি বাঁড়ুয্যের মতো ভেটারানরাও পাগল হয়ে যেত।'

নলিনাক্ষ আর সেখানে বসল না। তার মনের খাতায় সেই আঙুল-কাটা পা-কাটা ছেলেটার ছবি তো উঠেই ছিল, তার পাশে এই মেয়েটার ছবিও যোগ হ'ল। কী যেন নাম? পূর্ণিমা সমাদ্দার। বেচারী!…আবারও ঐ কথাটা মনে হ'ল। অমন সন্তান হারিয়ে গেল—ওর বাবা মার কী অবস্থা! গলা দিয়ে কি এর পর ভাত নামছে?

॥ ২ ॥

বাড়ি ফিরে রাত্রে খেতে বসেছে—অন্যমনস্ক হয়েই খাচ্ছিল, কানে গেল বৌদি বলছেন, 'আচ্ছা, আমাদের এই সামনের বাড়ির মিস্টার চাকলাদার—এত পয়সা পায় কোথায় বলতে পারো?'

অন্যমনস্ক ভাবেই নলিনাক্ষ জবাব দিল, 'কেন? এত পয়সা দেখলে কী ক'রে? খুব কি খাওয়াচ্ছে তোমাদের?'

'আহা! আমাদের খাওয়াতেই বুঝি অনেক খরচ হয়? কথার ছিরি ছ্যাখো। আমি দেখব কি, তোমাদের চোখ নেই? ঐ ঢাউস গাড়ি কিনেছে কোন কন্‌সালেটের, ছিয়াত্তর হাজার টাকা নাকি দাম, জানি নে বাবু—বৌ তো বলে বেড়ায়। তাতেও কুলোয় না, স্ত্রীর, ছেলেমেয়েদের সব আলাদা গাড়ি। স্ত্রীর গাড়িও অস্টিন কেম্বি.জ, পুরো এয়ার-কণ্ডিশ্যন করা।······আর খাওয়ানোর ব্যাপারই বা কম কি! এই তো ছোট মেয়ে অঞ্জুর জন্মদিনে কেটারার ডেকে পাঁচশো লোক খাওয়ালে! ঐ ডিশ, কোন্ না ষোল টাকা ক'রে নিয়েছে ওরা। তাছাড়াও ধর দৈ-মিষ্টি আছে। নাৎনীর পুতুলের বিয়ে হ'ল—সানাই বাজিয়ে যজ্ঞি ক'রে। এতখানি বয়সে শুনি নি তখনও!··· এই তো জানলা থেকে দেখতে পাই, যখনই পকেট থেকে টাকা বার করে—গোছা গোছা একশো টাকার নোট বেরিয়ে আসে!'

বৌদি বেশ শব্দ ক'রেই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়েন। আবারও একটু পরে বলেন, 'আচ্ছা, লোকটা করে কী? কৈ সেকথা তো কখনও শুনি নি—?'

'কে জানে!' নলিনাক্ষ জবাব দিল, 'আমি কি ক'রে জানব! ও নিয়ে মাথা ঘামানোর আমার দরকারই বা কি? করে একটা কিছু নিশ্চয়—ব্যবসা ট্যবসা। চাকরিতে অত পয়সা হয় না।'

সত্যিই, কথাটা কিন্তু এত দিন ওর মাথায় যায় নি। কী করে—কিসের ব্যবসা যে, এত পয়সা? প্রায়ই তো বাইরে যায় দেখা গেছে। এই তো কিছুদিন আগেই সবাইকে নিয়ে সিমলে গিছল!

এখান থেকে প্লেনে চণ্ডীগড় গিছল, সঙ্গে তিন-চারটে ঝি-চাকর সুদ্ধ। সে খবরটা অবশ্য ওকে মিঃ চাকলাদারই দিয়েছেন, সেই সঙ্গে জ্ঞানও দিয়েছেন একটু, 'না মশাই, মিড্‌ল্‌-ক্লাস মেণ্টালিটি আমি বুঝি না। আফটার অল, এভরিথিং কন্‌সিডারড্‌ অ্যাণ্ড রেকন্‌ড্‌—প্লেনেই সস্তা পড়ে। তিনদিন ধরে গাড়িতে গেলে এতগুলো লোকের খাওয়ার খরচাই কত পড়ত! তাছাড়া শরীরের ওপর দিয়ে ধকল যেত কতখানি ভাবুন তো! তাছাডা, আফ্‌টার অল্‌, আমাদের সময়ের তো মূল্য আছে! বেকার কি লোফার তো নই!'

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়েই যেন নলিনাক্ষ বলে, 'কে জানে, বোধ হয় ফাটকা টাটকা খেলে। শেয়ার মার্কেট ছাড়া অত পয়সা কিসে হবে?'

বৌদি ধিক্কার দেন, 'কে জানে আর কে জানে! অত বড খবরের কাগজে কাজ করছ—এই খবরটুকু বার করতে পারো না?'

নলিনাক্ষ উত্তর দেয়, 'কে কি দিয়ে ভাত খাচ্ছে, কে ফাটকা কি রেস খেলে টাকা রোজগার করছে—এই সব খবর খুঁজে বার করাই বুঝি খবরের কাগজের কাজ! এমন তো লাখ লাখ লোক রোজগার করে। কাগজের কা এত গরজ সে খবর বার করা।···খবর আসে যেটা সেটা ছাপা হয়।···আর আমি তো কলম লিখি, রিপোর্টার তো নই, নইলে না হয় একদিন ইন্‌টারভিউ নিতাম একটা! আর, আফটার অল—আমার গরজই বা কি?'

মিঃ চাকলাদারের কথাটা মনে ক'রেই 'আফটার অল' বলে* নলিনাক্ষ, ঐ শব্দটা না বলে উনি থাকতে পারেন না।

ব'লে নিঃশব্দে খানিকটা হেসে নেয়—কথাটা মনে পড়ে।

অপিসে যাতায়াতের পথে ঐখানটায় এসে প্রায়ই চেয়ে চেয়ে দেখে নলিনাক্ষ। ছেলেটাকেই খোঁজে। কিন্তু এর পর বেশ কদিন আর দেখতে পেল না। বোধ হয় জায়গা বদলে বদলে ভিক্ষে করে,

হয়ত এখানে চেষ্টা ক'রে দেখেছে—প্রতিযোগিতা বেশী। হয়ত আর এদিকে আসবেই না।···না দেখতে পেয়ে একটু যেন হতাশই হয়। ছেলেটাকে ওর দেখতেই ইচ্ছে করে—এমনি শুধু মাত্র কৌতূহল নয়।

দেখা মিলল একেবারে দিন সাতেক পরে। সেদিনটাও তেমনি অসহ্য গরম। তেমনি কেন—আরও বেশী। বেরোবার আগেই খবর পেয়েছে—১১০° উঠেছে, আগেকার হিসেবে। বেলা দেড়টা তখন। তাপটাও সেই সময়ই সব চেয়ে বেশী। ফলে রাস্তা কলকাতার হিসেবে জনবিরল। গাড়িতে-বাসে বসেও যেন খাবি খাচ্ছে লোক—রাস্তায় পীচ গলে তলতল করছে, গাড়ির চাকা আটকে আটকে যাচ্ছে। রিক্শাওলারা যাহোক ক'রে জুতো যোগাড় ক'রে পরে নিয়েছে বেশির ভাগ, যে যা পেরেছে। একজন তো—লক্ষ্য ক'রে দেখল নলিনাক্ষ, একজোড়া ছেঁড়া কেড্‌স বোধ হয় কুড়িয়ে পেয়েছে কোথাও থেকে, তার পায়ের চেয়ে অনেক বড়—সে দড়ি দিয়ে সে-দুটো পায়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে—পাছে খুলে খুলে যায়—এত কাণ্ড করেছে ঐ জন্যেই—তবু কোন-মতে পায়ের তলাটা তো বাঁচবে।

এরই মধ্যে চোখে পড়ল ছেলেটা।

সেই জ্বলন্ত আঙরার মতো রাস্তায় খালি পায়ে তেমনি লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে, আজ লাঠিও নেই একগাছা, এক পায়েই—যাকে ইংরিজীতে 'হপ্‌' করা বলে—সেই ভাবে চলছে। গলা পীচ লেগে পায়ের তলাটা জুতোর মতো হয়ে গেছে, তবু তাতে যে গরমটা লাগছে না তা নয়। সেদিনের মতোই দরদর ক'রে ঘামছে। চুলগুলো রুক্ষু নইলে মনে হ'ত চান ক'রে এসেছে কোথা থেকে। ছেঁড়া জিনের হাফ প্যাণ্টটাও ভিজে উঠেছে; আজ গায়ে গেঞ্জি নেই, তার বদলে একটা ছেঁড়া ঝলঝলে জামা গায়ে—সেটা গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে গেছে।

ভারী মায়া হ'ল নলিনাক্ষর। বাসটা দাঁড়িয়েই ছিল, এখন সিগন্যাল পেয়ে স্টার্ট দিতেই চট ক'রে নেমে পড়ল। কোনমতে তিন-

চারটে গাড়ির ফাঁক দিয়ে গলে পশ্চিম দিকের পেভমেণ্টে উঠে, ওরই মধ্যে একটু ছায়া খুঁজে নিয়ে ইশারা ক'রে ডাকল ছেলেটাকে।

সাগ্রহেই ছুটে এল ছেলেটা। নলিনাক্ষর আগে মনে হয়েছিল একটা পুরো টাকাই দেবে ওকে অবাক করে দিয়ে, বলবে, এই রোদে আর ভিক্ষে করতে হবে না, ঘণ্টাখানেক কোন গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে থাক। কিন্তু পকেটে হাত দিতে গিয়েও দিল না। চোখে পড়ল একটা আইসক্রীমের ঠেলাগাড়ী। কী ভেবে বলল, 'এই, আইসক্রীম খাবি?'

ছেলেটার সুন্দর চোখ দুটো লোভে জলে উঠল। সেই সঙ্গে একটু অবিশ্বাসের ছায়াও যেন ফুটে উঠল—তার পাশাপাশি। তবে তার মধ্যেই প্রবল ঘাড় নাড়ল—খাবে।

আইসক্রীমওলাটাকে ডেকে স্টিক নয়, একটা কাপই দিতে বলল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল, এই গরম, এত ঘামের মধ্যে আইসক্রাম খাওয়া কি ঠিক হবে? যদি সর্দিগর্মি হয়ে যায়? গরিবের ছেলে ভিক্ষে ক'রে খেতে হয়—জ্বর হয়ে পড়ে থাকলে এক ফোঁটা ওষুধও জুটবে না তো। খেতেই বা দেবে কে? ছেলেটা বোধ হয় ওর মুখের সেই ভাবান্তর, সেই সামান্য ইতস্তত ভাবটাও লক্ষ্য করেছিল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না না, আমার কিছু হবে না। এই তো—এই অবস্থায় গিয়ে ঠাণ্ডা জল খেয়ে এলুম এক জায়গা থেকে—'

নলিনাক্ষ দাম চুকিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমার নাম কি খোকা?'

'নাম!' একটু যেন ভুরু কোঁচকাল একবার। তার পর বলল, 'আপনি তো হিন্দু, না? আমার নাম প্রফুল্ল। আসলে আমাকে ডাকে কেলো বলে।'

'তা হিন্দু কিনা জিজ্ঞেস করলে কেন?' নলিনাক্ষর কৌতূহল বেড়ে গেল।

'না, আমাকে বলে দিয়েছে, মুসলমান কেউ জিজ্ঞেস করলে হামিদ

নাম বলতে। তাহলে তারা ভিক্ষে বেশী দেবে।'

'কে এসব বলে দেয়? তুমি থাকো কোথায়? কে আছে তোমার?'

এবার স্পষ্টই বোঝা গেল ওর বিপন্ন ভয়ার্ত ভাবটা। মুখ শুকিয়ে উঠেছে, হাতের মধ্যে অতবড় আইসক্রীমের কাপটা থাকা সত্ত্বেও।

বললে, 'থাকি? ঐ বেনেপুকুরের কাছে একটা বস্তিতে।'

'তা তোমার এমন হ'ল কি ক'রে?'

'য়্যাকৃসিডেণ্ট।' সংক্ষেপে বলল ছেলেটা। সাবধানেই উচ্চারণ করল শব্দটা। যেন কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। মনে করে করে বলল।

নলিনাক্ষ বলল, 'তা তাতে তো সব কটা আঙুলই যাবে। কিংবা এক ধার থেকে। এমন মাঝের তিনটে আঙুল কাটল কি ক'রে?'

কোন জবাব দিল না ছেলেটা। ঘামছে তেমনি দরদর ধারে, মনে হ'ল বড় বড় ফোঁটায় ঘাম ঝরে পড়ছে আইসক্রীমের ওপর।

'তা তোমার কে আছে, বাড়িতে? মা বাপ নেই? তোমাদের মতো ছেলেদেরও তো কাজকর্ম শেখাবার ব্যবস্থা আছে—সে সব শিখলে আর এত কষ্ট করতে হয় না? শিখবে? ছাখো, তাহ'লে আমি ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি।'

ছেলেটা যেন পাঙাস হয়ে উঠল একেবারে। একবার ভয়ে ভয়ে ওদিকের ফুটপাথটার দিকে চেয়ে—বাকি সবটা আইসক্রীম এক সঙ্গে মুখে পুরে যেন এক লাফে একটা দোতলা বাসের আড়ালে চলে গেল। ঠিক সেই সময়ই উত্তর দিকের লাইন ছেড়েছে। পর পর কতকগুলো বাস, মিনি-বাস, গাড়ি, কোম্পানীর ভ্যান—সার সার চলল—গিয়ে খোঁজা সম্ভব নয় সে অবস্থায়—আবার যখন গাড়ি দাঁড়াবার পালা এল, তখন আর কোথাও দেখা গেল না ছেলেটাকে। ভিক্ষেও করছে না, যেন বাতাসে উবে গেছে।

বেশ একটু অবাক হয়ে গেল নলিনাক্ষ। হঠাৎ এত ভয় পেয়ে গেল কেন ছেলেটা? ওদিকে চেয়ে কী দেখল? কোন লোককে দেখেই ভয় পেল নাকি? সে শুনেছে এই সব ভিখিরীদের 'মেট'

থাকে—তারাই এনে ছেড়ে দেয়, আবার বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে যায় ডেরায়, এও সেই ব্যাপার নাকি?

যেদিকে চেয়েছিল ছেলেটা, নলিনাক্ষও ভাল ক'রে চেয়ে দেখল। কৈ, কেউ তো কোথাও নেই, পুব দিকের ফুটপাথটাই তো ফাঁকা। শুধু পানওলার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একটা লোক বিড়ি টানছে। সাধারণ চেহারার, হিন্দুস্থানী মজুর বা দুধওলা—এই রকম শ্রেণীর লোক। সে এদিকে চেয়েও নেই, ঐ দিকেই ফিরে বোধ হয় পানওলার সঙ্গে গল্প করছে। আর কোন লোকই তখন চোখে পড়ল না ছেলেটা যাকে দেখে এত ভয় পেতে পারে।

আর মেট থাকলেই বা কি? তার জীবনের উন্নতিও বুঝল না ছেলেটা? নলিনাক্ষর ঠিকানাটাও তো জেনে নিতে পারত। কিংবা আবার কবে এখানে আসবে সেটা জানিয়ে দিতে পারত। কী বোকা ছেলেটা!

একটু ক্ষুণ্নই হ'ল নলিনাক্ষ। আসলে ছেলেটার কোন উপকার করতে পারলে ভাল লাগত ওর। সেই জন্যেই কেমন যেন একটা অবুঝ অভিমানও বোধ হতে লাগল। তার আর কি, ও যদি নিজের ভাল না বোঝে নলিনাক্ষর কী এত মাথা-ব্যথা? গোল্লায় যাক! —এই কথাটা নিজেকে বার বার বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল।

একেবারে বাসে উঠে লক্ষ্য করল—ওধারের ঐ লোকটা পান-ওলার আয়নার দিকেই চেয়ে আছে একদৃষ্টে। আয়নাটা বেশ বড় আর উঁচু; রাস্তার এদিকটা তাতে প্রতিবিম্বিত হ'তে কোন বাধা নেই।

॥ ৩ ॥

বৌদির শরীর খারাপ, অনেকদিন ধরেই বলছেন। মৃদু অনু-যোগই করছেন বলতে গেলে, দেবরের হৃদয়হীনতায়। এবার আর কিছু না করলেই নয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল দার্জিলিঙ। কিন্তু সেখানে

পাঠানোর অসুবিধা অনেক। কাছাকাছি কোথায় পাঠানো যায় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা যোগাযোগ হয়ে গেল। ওর আপিসের নগেনবাবুর কে এক আত্মীয় বারো মাস পুরীতে বাস করেন। রিটায়ার্ড সরকারী কর্মচারী। অকৃতদার। একটি চাকর নিয়ে শুধু থাকেন। তিনি এবার তীর্থে যাবেন। বাড়িতে কাকে রেখে যান এই চিন্তায় পড়েছেন। লীজ নেওয়া বাড়ী। বারোমাস থাকেন বলে ছুটো-একটা জিনিসও করেছেন। কেউ যদি না থাকে তো দরজা ভেঙে চুরি হয়ে যাবে! বুড়ো মানুষ—চাকরকে নিয়ে যেতে হবে। একা যেতে পারবেন না। তিনি ভাল একটি পরিবার খুঁজছেন, যারা মাসখানেক থাকবে অন্তত, আর ঘরবাড়ি নোংরা করবে না। ভাড়া তিনি চান না, তবে কেউ যদি দিতে চায় তো আপত্তিও করবেন না, যে যা দেয় খুশী মনেই তাই নেবেন। মোদ্দা ঐ ছুটি শর্ত, বাড়ি পরিষ্কার রাখা চাই, আর কাচের বাসন ব্যবহার করা চলবে না। কাটগ্লাসের দামী জিনিস তাঁর, বিলিতী প্লেট, জিনিস-পত্র নষ্ট না হয়। কেউ কি তেমন লোক আছে নলিনাক্ষর সন্ধানে? নগেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

নলিনাক্ষর কাছে এটা দৈবপ্রেরিত বলেই মনে হ'ল। তৎক্ষণাৎ কথা দিয়ে দিল একেবারে। তারপর বাড়িতে এসে বৌদিকে খবরটা বলল। রাত্রে 'কন্‌ফারেন্স' বসিয়ে স্থির হ'ল, নলিনাক্ষ বৌদিকে পৌঁছে দিয়ে প্রথম দিকে দিন দশেক থেকে আসবে, দাদা মাঝে দিন দশ-বারো গিয়ে থাকবেন, শেষের দিকে বৌদির ভাই গিয়ে আর দশ-বারো দিন থেকে সবাইকে নিয়ে ফিরবে। মাসখানেক লাগবার কথা নগেনবাবুর সেই পিসেমশাইয়ের; কুণ্ডু স্পেশালে গেছেন, মাপা দিন ওঁদের—তবু যদি দৈবাৎ কলকাতায় এক-আধদিন আটকে যান, তাঁর ফেরা পর্যন্ত বৌদি থাকবেন এই বন্দোবস্ত আছে।

বৌদির তো উৎসাহের অবধি নেই। তিনি কখনও পুরী যান নি। এমনিও গত ছু বছরে নাকি কোথাও বেরোতে পারেন নি

—তিনি ছেলেমানুষের মতো খুশী হয়ে উঠলেন। নলিনাক্ষরও খারাপ লাগছিল না, চক্রতীর্থে প্রথম সারিতে বাড়ি। সোনার গৌরাঙ্গ আর রামকৃষ্ণ মঠের কাছে—বেশ জনবসতিও আছে, একেবারে নির্জন নয়।

কিন্তু পুরীতে পৌঁছে বৌদির আনন্দ যেন একটু স্তিমিত হয়ে গেল। ওদের বাড়ি মাঝারি কেন, ছোটই, ওপরে দুটো নিচে দুটো ঘর। পিসেমশাইয়ের আর ওর চেয়ে বেশী লাগবেই বা কেন? নিচের ঘরটা তো অব্যবহার্যই পড়ে থাকে; কিন্তু ঠিক পাশেই এক বিরাট বাড়ি—কোন্ এক মারোয়াড়ির—দেখা গেল তার পিছনে অতি পরিচিত এবং বৌদির চোখের-বালাই খান তিনেক ঢাউস ঢাউস গাড়ি দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ মিঃ পরেশ চাকলাদাররা ইতিমধ্যেই সপরিবারে এসে গেছেন। দিন-চারেক আগে মোট-মাটারি নিয়ে রওনা হ'তে দেখেছে বটে—কিন্তু ওঁরা যে এত দেশ থাকতে এখানেই আসছেন তা কে ভেবেছিল? সাহেব মানুষ, অত ধনী—কাশ্মীর, নিদেন পক্ষে দার্জিলিঙ কি শিলং যাবেন এই-ই ভেবেছে।

বৌদি মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'আ গেল যা! মড়ারা এখানেও এসে জুটল। কোথায় ভাবলুম কটা দিন ওদের আর মুখ দেখতে হবে না, নিশ্চিন্তি থাকব—তা নয়। ঠিক এসে হাজির হয়েছে! ঐ যে আমার মা ছড়া কাটেন না—ওরে ও শাক-অম্বুলি কোন ঘাটে তুই পা ধুলি, আমি না আসতে তুই এলি! তা এও হ'ল তাই! আপদ এসে একেবারে ঘাড়ের ওপর পড়ল!'

নলিনাক্ষ হেসে বলল, 'তা তোমারই বা অত রাগ কেন ওদের ওপর? কী করেছে তোমার?'

'না বাপু। ওদের ঐ অত চাল আমার সহ্য হয় না। তা যাই বলো আর যাই ভাবো!'

গাড়ি থেকে নেমে মালপত্র নিয়ে থিতিয়ে বসে বাজারের দিকে

যাচ্ছে—পরেশ চাকলাদারের সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল, 'এই যে, বা! আপনারাও এসে গিয়েছেন। খুব ভাল হ'ল। কদিন আছেন তো। তবু চেনাশুনো লোক—একটু গল্পস্বল্প করা যাবে। ভগবানের ব্যাপার দেখুন মশাই, ওখানেও প্রতিবেশী, এখানেও কেউ জানি না অপরে কোথা যাচ্ছে—ঠিক পাশাপাশি বাড়িটি হয়ে গেল। আসবেন অতি অবিশ্যি। বিকেলের দিকে আসুন না, এখানেই চা খাবেন। বৌদি ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে আসুন—প্লীজ!'

তখনকার:মতো 'হেঁ-হেঁ, দেখি, আসব বৈ কি—অবিশ্যি আসব—তবে আজ হবে কিনা—হেঁ-হেঁ—' বলে কাটিয়ে চলে গেল নলিনাক্ষ।

বৌদি শুনে মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তা আর নয়! এলুম দুটো দিনের জন্যে জিরুতে, আজই গিয়ে ওঁদের দরবারে হাজরে দিতে হবে। আসলে ওর গিন্নী চালের কথা শোনাবার লোক পাচ্ছে না বোধ হয়, পেট ফুলে মরে যাচ্ছে। দু'চোখের বালাই—এই সব হঠাৎ-বড়লোক লোকগুলো।'

বিকেলে বেরিয়ে মন্দির ও বাজার ঘুরে এসে বৌদি আর কোথাও বেরোতে চাইলেন না। সমুদ্র তো এখান থেকেই দিব্যি দেখা যাচ্ছে, কাছে গিয়ে বেশী কি হাত বেরোবে? তা ছাড়া এই ঘোর কৃষ্ণপক্ষ—কী এমন দেখবেই বা মাথামুণ্ডু! চাঁদনী রাত হলেও না হয় কথা ছিল। ছেলেমেয়েকেও ছাড়তে রাজী নন তিনি, সমুদ্রের ধারে অনেক কিছু থাকে, পোকামাকড়—আর এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কীইবা বুঝবে সমুদ্রের?

কিন্তু নলিনাক্ষর ধারণা অন্য। সে এর আগে বহুবার পুরী এসেছে, গোপালপুর ওয়ালটেয়ার গেছে, সমুদ্র সম্বন্ধে নিজেকে সে অথরিটি ভাবে। তার বিশ্বাস চাঁদনী রাতের শোভা বরং কিছুটা একঘেয়ে, অন্ধকার রাত্রের বৈশিষ্ট্য বেশী। বিশেষ যদি একটু মেঘলা থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে ঢেউ ভাঙার ফসফোরাস-

দাপ্তি যখন সেই অন্ধকারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অগ্নিময় সর্পের মতো ছড়িয়ে পড়ে—তখন তাকে ঈশ্বরেরই এক ভয়ঙ্কর রূপ মনে হয়।

বৌদি অবশ্য ওকে যেতে বাধা দিলেন না, এক পেয়ালা চা খেয়েই টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়ল নলিনাক্ষ।

সমুদ্রতীর তখন একেবারেই জনবিরল। কেউ থাকবে তা সে আশাও করে নি অবশ্য। তার মতো পাগল কে আছে যে এই অন্ধকারে বসে বসে সমুদ্র দেখবে! আর তাতে সে দুঃখিতও নয়, এ গম্ভীর রূপ একা বসেই উপভোগ করতে হয়। তার কাছে কিছুই নেই, হাতঘড়িটাও বুদ্ধি ক'রে খুলে রেখে এসেছে। চোর ডাকাত ধরে কোন ক্ষতি করতে পারবে না! এক এই টর্চ—তা তার জন্যে কেউ রাহাজানি করবে বলে মনে হয় না।

তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে, মন এটা-ওটা ভাবতে ভাবতে সেই ভিখিরী ছেলেটা—প্রফুল্লর কথায় চলে গেল। নিত্যই উৎসুক হয়ে চেয়ে দেখে কিন্তু এর মধ্যে আর একদিনও দেখতে পায় নি তাকে। কে জানে কেন—ছেলেটা যেন তাকে কি মায়ায় আচ্ছন্ন করেছে।

খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল—এলোমেলো চিন্তায়। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে কোন হুঁশও ছিল না। দূরে মধুপুর হাউসের জোর আলোটার আভা এসে পড়েছে—তবে সেটা ওর এই শোভা উপভোগে খুব ব্যাঘাত করতে পারে নি। বরং ওর চার পাশের অন্ধকারটাকে যেন আরও গাঢ় ক'রে তুলেছে। বসবার সময় বেছে বেছে এই দিকটায় এসে বসেছে, রাঠোর-নিবাসের সামনের ঝাউ গাছগুলোর আড়ালে। গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে, মনে হচ্ছে সে অন্ধকার যেন তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে, সে ডুবে গেছে তার মধ্যে। এই সময় হঠাৎ মধুপুর হাউসের আলোটাও কে নিভিয়ে দিলে, আরও গাঢ় আরও নিঃসীম হয়ে উঠল চারিদিক।

অকস্মাৎ, যেন সেই অন্ধকারেরই একটা অংশ—অন্ধকার মহাশূন্য

থেকেই কায়া সংগ্রহ ক'রে—যাকে বলে মেটিরিয়ালাইজ করা—একেবারে তার পাশে এসে ঝুপ ক'রে পড়ল।

কোন জীবিত প্রাণী? মানুষ? খুনে ডাকাত?

এসব কোন কিছু ভাববারও অবসর ছিল না। নিদারুণ চমকে উঠল নলিনাক্ষ, ভয়ই পেয়ে গেল সে, অজানা অথবা দেহের সহজাত একটা আতঙ্ক। আর সেই ভয়ে তার গলা দিয়ে শুধু একটা অব্যক্ত জান্তব আর্তস্বর বেরিয়ে এল আপনা-আপনিই।

যে এসে বসেছে, সে বোধ করি এ অবস্থাটা আগেই অনুমান ক'রে নিয়েছিল। জানত এটা হবে। মানব মনের এ স্থূল অনুভূতিটা তার জানা-ই। সে ওর এই স্বর বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বলে উঠল, 'চুপ, আমি এককড়ি।'

এককড়ি। হ্যাঁ, গলার আওয়াজটা সেই রকমই বটে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—ধড়ে প্রাণ আসা যাকে বলে—আশ্বস্তও হ'ল একটু। কটা মুহূর্তেরই ব্যাপার, কিন্তু কখনও কখনও শুধু ব্রহ্মারই নয়, মানুষেরও এক পলকে এক যুগ কেটে যায়, যুগান্তের অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

এবার ভরসা ক'রে তাকিয়ে দেখল, অন্ধকারেই যতটা দেখা সম্ভব—কারণ যে এসেছে সে আগেই—নিজের পরিচয় দেবার সঙ্গেই চাপা গলায় বলে দিয়েছে, 'টর্চ জ্বালবেন না, দোহাই।'—সি. বি. আই. ইন্‌স্‌পেক্‌টর দেবীবাবু, দেবীপদ বসু। মাত্র কিছুদিন আগেই নলিনাক্ষর প্রাণরক্ষা করেছিল, সেদিনের সে দুঃস্মৃতি মনে পড়লে আজও—কী হ'তে পারত ভেবে—ভয়ে যেন হিম হয়ে যায় বুকের মধ্যেটা। সেই থেকেই, সেই উপলক্ষ ক'রেই একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে।*

এককড়ি নামটার মধ্যেও একটা রহস্য আছে। সেই ঘটনারই রহস্য। এখন সেটা কৌতুক রহস্যে-পরিণত হয়েছে। ওর বন্ধু বরুণ এক 'স্মাগলার'দের চক্রে পড়ে গিয়ে ছল। সেই সূত্রেই এক লেডী-

* লেখকের 'তৃতীয় রিপু' গ্রন্থে সে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে।

ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়—এই দেবীপদ বোস ভেতরের খবর নেবার জন্যে এককড়ি নাম নিয়ে বরুণের বাড়ি চাকরের কাজ নেয়। সেই থেকেই এককড়ি নামটা ওদের মধ্যে চালু হয়ে গেছে। উভয়পক্ষই সেটা উপভোগ করে। বরুণ সম্প্রতি চূড়ামণি বলে সাঁওতাল মেয়েটাকে বিয়ে করেছে—তাতে দেবীপদ উপহার দিয়েছে—'দাস শ্রী এককড়ি' এই সই ক'রে।

চিনতে পারার পরই নলিনাক্ষ জড়িয়ে ধরেছিল দেবীপদকে, সেইভাবেই ধরে রেখে বলল, 'বাপ্‌রে, এমন ভাবে ভয় পাইয়ে দিতে হয়? তা এখানে? আর এই অন্ধকারেই বা কেন, এমন ভূতের মতো?'

দেবীপদ বলল, 'কাজেই এসেছি। একটা খোঁজে। সেটা দিবাভাগে দৃশ্য নয়, আলোতেও নয়। তাই এই প্রেতাত্মার মতো অন্ধকারে ঘোরা।'

'কিন্তু যাদের দেখার জন্যে এত কাণ্ড—তারা জানে না আপনি পিছনে লেগেছেন?'

'জানে বৈকি। এখনও আমরা এত সতর্ক হ'তে পারি নি যে তাদের কাছে খবর পৌঁছবে না। সর্বত্রই পেড-ম্যান আছে ওদের। জানেন না, জহরলাল নেহরুর টাইপ-রাইটারের ব্যবহার করা কার্বন পেপারও চুরি যেত? তারাও আছে, আমরাও আছি। আমাদের পেছনে তারা আছে কিনা তাও দেখার ব্যবস্থা আছে। ঐ রামকৃষ্ণ মঠের ছাদে একজন আছে। এদিকের এক বাড়ির ছাদে আর একজন। তাদের কাছে পাওয়ারফুল দূরবীন আছে। এই অন্ধকারেও আমাকে ফলো করছে তারা দূরবীন দিয়ে।...তা আপনি হঠাৎ পুরীতে? বৌদিও তো এসেছেন দেখছি।'

বলল নলিনাক্ষ কারণটা। বৌদির চেঞ্জ দরকার, একটা বাড়িও পাওয়া গেল—ফার্নিশ্‌ড্‌—এসে পড়েছে। দিন দশেক থেকে ও চলে যাবে। দাদা আসবেন।

বলতে বলতেই মনে পড়ে গেল কথাটা। সেদিনেরই কাগজে

একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, মানে কলকাতায় আগের দিন দেখে এসেছে—ছবি দেওয়া বিজ্ঞাপন—কপালে কাটা দাগ, থুতনিতে একটা তিল আছে, সাত বছরের মেয়ে, ডাকনাম পারুল—আরও কী সব বিবরণ—খবর দিলে পাঁচশো টাকা পুরস্কার পাবে। এখানে এসে সেই কথাটাই ভাবছিল। সেই প্রসঙ্গেই ভিখিরী ছেলেটার চিন্তায় চলে গিছল। কথার মধ্যেই তাই হঠাৎ বলে উঠল, 'আচ্ছা দেবীবাবু, আজকাল প্রায়ই যে এত ছেলেমেয়ে হারাচ্ছে —এর ব্যাপারটা কি বলুন দিকি? খবরের কাগজ খুললেই একটা না একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। সুনীতিবাবুর ভাষায়—হোয়াট ইজ বিকজ অফ ইট? ডঃ সুনীতি চাটুজ্যের রসিকতা এটা—কোন দক্ষিণ দেশীয় ভদ্রলোক বলতেন—শিক্ষিত ভদ্রলোক।'

অন্ধকারেই যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখল এককড়ি। তারপর তেমনি হিস-হিসে গলায় বলে উঠল, 'এই মরেছে! আবার বাঘের গর্তে পা দেবার তালে আছেন নাকি? এ কিন্তু আরও সাংঘাতিক। খুব সাবধান! আপনি বুঝি ফ্যাসাদ না বাধিয়ে থাকতে পারেন না?'

'না না, সে সব কিছু নয়। এমনি, পর পর বিজ্ঞাপনগুলো চোখে পড়ে কিনা—তাই হঠাৎই মনে এল কথাটা। আপনিই বা ওসব ভাবছেন কেন?'

এবার নলিনাক্ষ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ওর মুখটা দেখার চেষ্টা করে।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা কথা মনে পড়ে যায় আবারও, 'আচ্ছা দেখুন—আপনি তো ঘোরেন টোরেন খুব, চৌরঙ্গী আর সুরেন বাঁড়ুয্যে রোডের মোড়ে যে সব ভিখিরী ট্রামে বাসে গাড়িতে ভিক্ষে করে—তাদের মধ্যে কালো মতো একটা ছেলে ছিল, তার নামও কেলো, তেরো চোদ্দ বছর বয়স হবে—একটা পা কাটা, ডান হাতের তিনটে আঙুল নেই—তাকে আর মোটে দেখতে পাই না, আসা যাওয়ার পথে চেয়ে চেয়ে দেখেছি—দু-তিন দিন নেমে খোঁজও করেছি অন্য ভিখিরীদের কাছে, কেউই বলতে পারে না। আপনার

চোখে পড়েছে কখনও? মনে পড়ছে এমন কারও কথা?'

দেবীপদ অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। মনে হ'ল যেন নিথর হয়ে গেল প্রসঙ্গটায়। হয়ত কিছুই না, মনে করারই চেষ্টা করছে। কিন্তু নলিনাক্ষর কেমন মনে হতে লাগল—এ নীরবতাটা ঠিক স্বাভাবিক নয়, দেবীপদ হঠাৎ চিন্তিত হয়ে উঠেছে কথাটা শুনে।

প্রায় মিনিট দুই-তিন পরে সত্যিসত্যিই গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল দেবীপদ, 'কেন বলুন তো? তার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক? শেষ কবে দেখেছেন তাকে? জানাশুনো ছিল, না এই পথেই দেখে-ছেন? নামই বা জানলেন কেমন ক'রে?'

'বাবা। আপনি যে পুলিসের লাইনে চলে গেছেন এক কথায়। রীতিমতো জেরা। এর মধ্যেও কোন ভয়ানক কথা আছে নাকি? আপনাদের স্বভাবটাই খারাপ হয়ে যায় এই কাজ ক'রে ক'রে—না? সবেতেই সন্দেহ জাগে।'

এই বলে নিজেই যেন প্রসঙ্গটা হালকা ক'রে নিয়ে খুলে বলল সব। প্রথম দিন দেখে মায়া হওয়ার কথা, শেষের দিনে আইসক্রীম খাওয়ানো, তার হঠাৎ পালিয়ে যাওয়া—সব। ইতিহাস শেষ হ'লে বলল, 'অন্য কোন ইন্‌টারেস্ট নেই আমার, জাস্ট হিউম্যান ইন্‌টারেস্ট। ছেলেটাকে দেখলে আপনিও বোধহয় ব্যস্ত হতেন তার কিছু ভাল করার জন্যে!'

'আপনিও বলার মানে? কথাটায় অত জোর দিলেন কেন? পুলিসে কাজ করলে কি ইনহিউম্যান হয়ে যায় বলে আপনাদের ধারণা?' হেসেই বলল দেবীপদ, কিন্তু তার পর আবারও গম্ভীর হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তার পর আস্তে আস্তে বলল, 'হেস্টিংস-এর কাছে গঙ্গায় কাদার মধ্যে তার ডেড্‌ বডি পাওয়া গেছে দিন-দশেক আগে। কেউ গলা টিপে মেরে জলে ফেলে দিয়েছিল। কারণটা কি, ঐ রকম ছেলেকে কে খুন করল ভাবছিলুম, এবার বুঝলুম। আপনিই কারণ!'

যেন গরম একটা কিছু ছ্যাঁকা দিল কে নলিনাক্ষকে। সে প্রায়

চাপা আর্তস্বরে বলে উঠল, 'আমি ! আমি তার মৃত্যুর কারণ !'

'হ্যাঁ, ঐ আইসক্রীম খাওয়ানো আর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাই কাল হয়েছে বেচারার। কেন যে আপনারা এত পরোপকার করতে যান !' তার পরই বেশ একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'বলছিলেন জড়ান নি। এই তো বেশ জড়িয়েছেন দেখছি। বাঘের গর্তে শুধু নয়, তার চোয়ালের মধ্যে পা দিয়েছেন একেবারে।...না, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না।'

'তার মানে ?'

কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর আর পাওয়া যায় না ! খুব চাপা, সামান্য একটা কুকুরের ডাক শুনতে পাওয়া যায় কাছাকাছি কোথাও থেকে। সঙ্গে সঙ্গে যেন অশরীরী কোন প্রাণীর মতোই অন্ধকারে মিলিয়ে যায় দেবীপদ।

যেমন ভাবে হাওয়া থেকে মূর্তি পরিগ্রহ করার মতো এসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই যেন হাওয়া হয়ে যায় আবার।

॥ ৪ ॥

ইংরেজীতে bewilderment বলে একটা শব্দ আছে—তার মানেটা যেন এতদিনে ঠিক বুঝতে পারল নলিনাক্ষ।

সে রাত্রের সেই অভিজ্ঞতার বিহ্বলতা বা বিভ্রান্তি কিছুটা কাটতেই তিন-চার দিন সময় লাগল প্রায়। যত সে কথা ভাবে, ততই যেন আরও গুলিয়ে যায় মাথাটা। অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, অবাস্তব মনে হয়। সত্যিই কি এককড়ি এসেছিল, না সারাদিনের ঘোরাঘুরি খাটুনির পর ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেছে সে ?

ঐ ছেলেটার কথা যে বলে গেল ? সেটা ?...আহা বেচারী !

আচ্ছা, সত্যিই কি তার মৃত্যুর জন্যে নলিনাক্ষই দায়ী ? ইস, কেনই বা দয়া করতে গিছল! কিন্তু তার সঙ্গে ওর এ বিপদের কী সম্পর্ক অনেক ভেবেও বুঝতে পারে না। ওকে কোন কাজ দিলে ভিক্ষে

ছেড়ে দেবে এই জন্তে? ভিক্ষেতে কি এত রোজগার হয় সত্যি-সত্যিই?

অনুতাপও হয়—আবার ভাবে, যদি সত্যিই তাই হয়—এমন কষ্ট ক'রে ভিক্ষের খাওয়া খেয়ে বাঁচবে, তার ভেতরও এত শাসন, এত নিষ্ঠুরতা, এত চক্রান্ত থাকে তো তার মরাই ভাল হয়েছে, রেহাই পেয়েছে সে। এ ভাবে বেঁচে থেকে কী পেত সে জীবনে আর?

মুশকিল হয়েছে এই—কথাটা যে খোলসা করতে পারত সেই দেবীপদরও কোন পাত্তা নেই আর। পথে ঘাটে, মন্দিরে বাজারে, সমুদ্রতীরে—কত চেয়ে চেয়ে দেখে—কোথাও চিহ্নমাত্র দেখতে পায় না। সেই যে অন্ধকারে এসে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, সেই কুকুর কাঁদার শব্দে চমকে উঠে—একেবারেই যেন প্রেতমূর্তির মতোই মিলিয়ে গেল, লোক ও লোকালয় থেকে। কিছু বুঝিয়ে বলল না, পরিষ্কার করল না বক্তব্যটা—বরং আরো খানিকটা রহস্যেরই সৃষ্টি ক'রে গেল। চাপা গলায় হিস হিস করার মতো শব্দে, ধমকের ভঙ্গিতেই বলে গেল, 'বাড়ি চলে যান এখনই। আর কোন দিন এমন ভাবে রাত্রে একা বেরোবেন না। উঠুন, উঠে পড়ুন। বেশীক্ষণ আপনাকে প্রোটেক্শ্যান দিতে পারব না আর।'

এই কথাগুলো নিয়েই আরও বেশী ভাবছে। বাঘের চোয়ালের মধ্যে পা দিয়েছে বলে গেল। সে ব্যাপারটাই বা কি? যাই হোক, সাবধানও হয়েছে, সমুদ্রের ধারে গেলেও বেলা থাকতে থাকতে ফিরে আসে। একাও যায় না আর।···

কিন্তু দিন পাঁচ ছয় কেটে যেতেও যখন দেবীপদর কোন খবর পেল না—তখন ব্যাপারটা একটু হাস্যকর বলেই মনে হ'ল। হয় সে স্বপ্ন দেখেছিল, নয় তো দেবীপদই একটু তামাশা ক'রে গেল, অন্ধকারে বসে ছিল বলে একটু মজা ক'রে গেল ভয় দেখিয়ে। আর সেও এমন বুদ্ধু—এই কদিন ভয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে, কত কি ভাবছে। ছোঃ!

কিন্তু ঠিক যখন কথাগুলোকে নিতান্তই অবাস্তব, স্বপ্নদৃষ্ট বলে ভাবতে শুরু করেছে, সেই সঙ্গে মনের প্রশান্তি ফিরে পাচ্ছে একটু একটু ক'রে, একটি নিদারুণ খবর এসে আবার সব ওলট পালট ক'রে দিল।

বৌদির ভাইঝি দোলাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দিন পাঁচেক আগে স্কুল থেকে হারিয়ে গেছে। ইস্কুলের গাড়ি ছাড়ার সময় তাকে পাওয়া যায় নি, ইস্কুলের ঝি ভেবেছে কোন বন্ধুর সঙ্গে তার গাড়িতে আগেই চলে গেছে। এমন নাকি এক আধ দিন গেছেও—বিশেষ বিপাশা বলে এক ব্যারিস্টারের মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব, তার বাবা যেদিন নিজে নিতে আসেন তখন তিনিই ওকে ডেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যান—এর মধ্যে যে একটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রশ্ন আছে, সেটা কারুরই মাথায় যায় না।

এদিকে বৌদির দাদা রথানবাবুরা ভাবছেন গাড়ির কোন গোলমাল ঘটেছে—চাকা ফুটো হয়েছে বা স্টার্ট নিচ্ছে না—ফিরতে দেরি হচ্ছে। শেষে যখন সে সব সম্ভাবনার সময়ও কেটে গেছে তখন মেয়েরা পুরুষদের খবর দিয়েছে, তাঁরা আপিস থেকে ফিরে ইস্কুলে গিয়ে খবর নিয়েছেন—কর্তৃপক্ষ কেউ নেই, দারোয়ান কিছু বলতে পারে নি। তার পর অবশ্য প্রিন্সিপ্যালকে পাওয়া গেছে, তিনি তখনই ইস্কুলে এসে ঝিকে ড্রাইভারকে ডেকে পাঠিয়েছেন—কিন্তু কেউই কোন খবর দিতে পারে নি, তাদের ধারণার কথা জানিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে। অতঃপর পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন খবর পাওয়া যায় নি। এতদিন তাঁরাও ব্যস্ত ছিলেন, তা ছাড়া শরীর খারাপ, চেঞ্জে এসেছে, মিছিমিছি উদ্বিগ্ন ক'রে কোন লাভ নেই বলেই সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন নি, কিন্তু আর দেরি করা উচিত নয় ভেবেই এই খবর পাঠাচ্ছেন। ইত্যাদি—

নলিনাক্ষর মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। দশ-এগারো বছরের

মেয়ে দোলা। সুন্দর দেখতে, তেমনি বুদ্ধিমতী। পড়াশুনোতেও ভাল। ভারী মিষ্টি স্বভাব। বৌদির বাপের বাড়ির সব ছেলেমেয়ের মধ্যে এই দোলাই ওর সব চেয়ে প্রিয়। কতদিন এসে থেকে গেছে। যখন আরও ছোট ছিল, ওর বিছানাতেই এসে শুত, বলত, 'গপ্প বলো না একটা নলিনকাকু, তুমি তো কত গপ্প লেখো। নতুন গপ্প বলতে হবে কিন্তু—' গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত।

সে অস্থির হয়ে উঠল। বৌদি কান্নাবাটি করছেন। সে জন্যও যত না হোক—নলিনাক্ষর নিজের মনের তাগিদও কম নয়। অথচ কীই বা করবে তাও ভেবে পায় না। বৌদি বলছেন, 'তুমি একবার যাও, তোমার কত জানাশুনো, তুমি গিয়ে চেষ্টা করলে পুলিস আরও য়্যাকৃটিভ হয়ে উঠবে।'

কিন্তু সে ধরনের চেষ্টায় কতটুকু বেশী ফল হবে তা বুঝতে পারে না নলিনাক্ষ। এদের ফেলে যাওয়াই কি ঠিক হবে! আঃ, এই সময় যদি দেবীপদকে পাওয়া যেত—

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল কথাটা। একটা কথা বলেছিল, 'দিবাভাগে দৃশ্য নয়। রাত্রেই ঘোরে সে জন্যে।' যদি এখন পুরীতে থাকে রাত্রেই দেখা পাবে। আর, মুখে যাই বলুক, তেমন বিপদ বুঝলে ওর দিকেও নজর রেখেছে নিশ্চয়। বিপদে গিয়ে পড়লে অন্তত ধমক দিতেও সামনে আসবে।

সে দিন অমাবস্যা, আকাশে মেঘের ভাবও আছে, যাকে কবিরা সূচীভেদ্য অন্ধকার বলেন তাই। মূর্তিমান ব্যাঘাত হচ্ছে শুধু ঐ মধুপুর হাউসের আলোটা। নলিনাক্ষ ওদিকটা এড়িয়ে, ছোট মন্দিরটাকে ডাইনে রেখে, একটা হেলে-পড়া বাড়ির পাশ দিয়ে নামল সমুদ্রর দিকে। টর্চ হাতে ছিল কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই জ্বালে নি। বিপদ যদি সত্যিই কিছু থাকে টর্চ জ্বেলে নিজের উপস্থিতি না জানানোই ভাল।

দেখা গেল ওর হিসেবে বা অনুমানে কিছুমাত্র ভুল হয় নি।

বাড়িটার সবটা হেলে-পড়া নয়, শেষের দিকে একটা আউট হাউস

মতো ছিল, সেইটেই হেলে পড়ে আছে দীর্ঘকাল, বসবাসের অযোগ্য হয়ে—কিন্তু ভেঙেও পড়ে যায় নি। বাড়িটা মাঝে মেরামত করিয়েছেন মালিক, এটায় হাত দেন নি। ওরা যেদিন প্রথম আসে সেদিন এ বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখেছিল, আজ সৌভাগ্যক্রমে অন্ধকার। বোধ হয় কেউ নেই, যারা ছিল কলকাতায় ফিরে গেছে।

ওদিক দিয়ে নেমে ঠিক খোলা জায়গায় পড়েছে—সেই হেলে-পড়া ঘর থেকেই কে একজন নিঃশব্দে অথচ তীরবেগে বেরিয়ে এসে ওর হাত চেপে ধরল।

ভয় পাবার কথা নয়, এইটের জন্যেই তো বলতে গেলে আসা—তবু বুকের মধ্যে একটা কাঁপুনি লাগে বৈ কি! সেটা বুঝেই যেন সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রায়-অদৃশ্য মূর্তি বলে ওঠে, 'আবার বেরিয়েছেন এই ভাবে। বারণ করেছিলুম না।' অর্থাৎ দেবীপদ।

বিপদের মুখে 'আপনির' দূরত্বটা আপনিই চলে যায়, ওকে একেবারে জড়িয়ে ধরে নলিনাক্ষ বলে ওঠে, 'তোমার খোঁজেই এসেছি ভাই। বাঁচালে। যে ভাবে খুঁজেছি আর ভেবেছি তোমার কথা, জগন্নাথই দয়া ক'রে বুঝি মিলিয়ে দিলেন।'

'শান্ত হোন, শান্ত হোন। বসুন এদিকটায়। পিছনে আমার লোক আছে, এখানে কিছু হবে না। ব্যাপারটা কি?'

খুলে বলল নলিনাক্ষ। দোলার হারানোর বিবরণ, এ পর্যন্ত যা যা খবর পাওয়া গেছে।

দেবীপদ চুপ ক'রে বসে শুনল সব, কেবল দারোয়ান ঝি আর ড্রাইভারের এজাহারগুলোর বেলায় দু একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করেছিল, আর ইস্কুলের নামটা জেনে নিয়ে বলেছিল, 'ও, মিস দাসগুপ্ত? তাঁকে আমি জানি, অত্যন্ত রেসপনসিব্‌ল্ মহিলা!'—তার পর নলিনাক্ষর কথা শেষ হতে শুধু বলল, 'এগারো বছর বয়েস, সুন্দর দেখতে? তবু ভাল। কুয়ায়েট কি ঐ রকম কোন আরব কানট্রির আমিরের হারেমে চালান হয়েছে, নইলে বিক্রা ক'রে দিত ক্রীতদাসী হিসেবে। আফ্রিকা কি ইটালীর কোন ক্ষেতে বিনা মাইনেয় সারা

দিন ভূতের মতো খাটতে হ'ত—পাহারা আর চাবুকের মধ্যে—রাত্রে কর্মচারীদের সঙ্গে শুতে হ'ত।'

'সে কি! কী সব বলছ মাথামুণ্ডু? এখনও ক্রীতদাস কোথাও আছে নাকি?'

'আপনি না খবরের কাগজের লোক? ময়রারা সন্দেশ খায় না শুনেছি, তা এও সেইরকম দেখছি যে।'

'তুমি বড্ড হেঁয়ালি করো ভাই।'

'আমি সত্যি আর স্পষ্ট কথা বলি, আপনাদের মন তৈরী নয় বলে বুঝতে দেরি হয়। আই অ্যাম পসিব্‌লি এ লিট্‌ল্ য়্যাহেড্ অফ ইউ। যা হোক, যা দরকার সব শুনে নিয়েছি, আপনি বাড়ি যান। আপনার জীবন আদৌ নিরাপদ নয়, এ জেনে রাখবেন। কে জানে দোলাকে অপহরণ আপনাকে শিক্ষা দেবার জন্যেই কি না! কেলোকে হারানোর শোধ।...যান, উঠুন।'

আর বসতে সাহস হ'ল না নলিনাক্ষর। দেবীপদর সঙ্গেও কথা বলার সময় হ'ল না। সে আগের দিনের মতোই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল চোখের নিমেষে।

সমুদ্রের ধার থেকে উঠে আসবার পথটা চাকলাদারদের বাড়ির সামনে দিয়ে। বাড়িটা পরিক্রমা ক'রে নলিনাক্ষদের বাড়ি ঢুকতে হয়। উঠে আসতে আসতেই দেখতে পেল চাকলাদারের বড় ঢাউস গাড়িখানা বেরিয়ে যাচ্ছে শহরের দিকে। এত রাত্রে আবার কোথায় যাচ্ছে? নাইট-শো সিনেমায় নাকি? বাজার হাট তো এতক্ষণে সব বন্ধ হয়ে গেছে। মন্দিরেও তো যেতে দেখে না বিশেষ—তবে?

গাড়িখানা দূরে চলে যাচ্ছে, নলিনাক্ষও নিজেদের বাসার দিকে মোড় ফিরছে—আর একটা ব্যাপার খেয়াল হল। মনে হ'ল অনেকক্ষণ ধরেই শুনছে, কানে আসছে, অত লক্ষ্য করে নি—কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ। চেনা চেনা, কিসের শব্দ এটা।

শব্দটা দূরে সরে যাচ্ছে, একটু পরে আর শোনা গেল না। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গেই যেন যাচ্ছে শব্দটা…তবে কি গাড়িরই কোন শব্দ উঠছে? ইঞ্জিনের—? আশ্চর্য, মনে হয় ঠিক যেন মানুষ গোঙাচ্ছে।

নিজেদের বাড়ি ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে গেল নলিনাক্ষ।

কথাটা ভাসা ভাসা ভাবেই মনে এসেছিল, কিন্তু সহজে ভেসে গেল না।

মানুষ? গোঙানি? সেই রকমই কিন্তু। চাপা গোঙানি একটা। মনে হচ্ছে যেন, গাড়ির কেরিয়ার থেকেই শব্দটা আসছিল।

না—বাতাসের শব্দ?

সমুদ্রের বাতাস বন্ধ দরজা জানলায় বাধা পেয়ে এই রকম গোঙানির শব্দ করে বটে। এখানে ঠিক বোঝাও যায় না ছাই।

বাতাসেরই শব্দ নিশ্চয়।

কিন্তু, কিন্তু থেমে—যেন মিলিয়ে গেল কেন?

দরজায় ধাক্কা খেয়ে বাতাসের শব্দ যদি হয়, সমুদ্রের হাওয়া তো এখনও সমান বেগে বইছে। দরজাও তো বন্ধ আছে, যেগুলো ছিল!

আর—মনে হচ্ছিল যেন ঐ গাড়িটার সঙ্গে সঙ্গেই দূরে সরে যাচ্ছিল।

কে জানে! অত আর মাথা ঘামাতে পারে না। আসলে এই সব ভেবে ভেবেই মাথা গরম হয়ে উঠেছে। নিজেরই ছায়াকে ভূত দেখছে। বাতাসের শব্দে গোঙানি শুনছে। হয়ত সাইলেন্সার পাইপে ফুটো হয়েছে কোথাও, তারই শব্দ ওটা। মনটা ঠিক প্রকৃতিস্থ থাকলে আগেই বুঝতে পারত।

দেবীপদটা এমন ভয় দেখায়! মজা দেখে—নাকি?

॥ ৫ ॥

পরের দিন বাজার থেকে ফিরে দেখল দাদা কমলাক্ষ পৌঁছে গেছেন। সেদিন ওঁর আসবার কথা নয়, এই জন্যই এসেছেন, দোলার ব্যাপারেই। তাঁরও বিশ্বাস, ভাইয়ের লেখক হিসেবে একটু নাম-ডাক হয়েছে, অত বড কাগজে চাকরি করে—সে চেষ্টা করলে পুলিস একটু বেশী মনোযোগ দেবে, আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

স্বামীকে দেখে বৌদি আরও কান্নাকাটি করছেন। 'এত দিন হয়ে গেল। সে কি বেঁচে আছে! ছাখো গে যাও কোথায় কে মেরে পুঁতে দিয়েছে।'

কমলাক্ষ বার কতক বৃথা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, 'খামকা তাকে মেরে ফেলে কার কি লাভ বলো। গায়ে এক-গা গহনা-গাঁটি থাকলেও বা কথা ছিলো। বরং ঐ নলিনের বন্ধু যা বলেছে সেই সম্ভাবনাই বেশী। কাবুলে কি জর্ডানে কি ইরানে চালান ক'রে দিয়েছে—'

'সে তো মরারই সামিল হ'ল, সে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল।'

বৌদির কান্না বেড়েই যায়।

সেদিনই রাত্রের গাড়িতে যাবে কিনা নলিনাক্ষ সেই আলোচনা হচ্ছে—হঠাৎ বাইরে মধুবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, 'নলিনাক্ষবাবু আছেন নাকি?'

বিরক্ত হ'লেও বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাতে হ'ল। কারণ 'আছেন নাকি'টা কথার কথা, জানলা থেকে দেখেই ডেকেছেন ভদ্রলোক।

মধুবাবু ওদের পিছন দিকে গাঙ্গুলীবাবুদের বাড়ি ভাড়া এসেছেন। নিজে যেচে আলাপ করেছেন সেই প্রথম দিনটিতেই। তারপর থেকে প্রায় রোজই আসেন। সুবিধের মধ্যে বেশীক্ষণ থাকেন না। দুটো চারটে কথা বলে—খুব দ্রুত ওদের হাঁড়ির খবর নিয়ে চলে

যান—আর, কখনও নিজের বাড়িতে যেতে বলেন না এদের। বৌদি বলেন, 'বলবে কি! গেলে যদি চা খাওয়াতে হয়! লোকটা হাড়-কিপটে। আমি দেখেছি জুলিয়াগুলো মাছ নিয়ে যায়, দেখলেই ডাকে—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনদিন নিতে দেখলুম না। ঐ দর ক'রেই সুখ।'

মধুবাবু ভেতরে এসে বিনা আমন্ত্রণেই চৌকীটায় বসলেন। বললেন, 'ইনি কে? দাদা বুঝি? মুখ দেখেই বুঝছি। আজকের গাড়িতে এলেন? তা হ্যাঁ মশাই নলিনবাবু, শুনলুম আপনাদের নাকি একটি মেয়ে হারিয়েছে?'

'হ্যাঁ। তা আপনি কোথা থেকে শুনলেন?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে নলিনাক্ষ।

'বাড়িতে এঁয়ারা বলছিলেন। কোথা নাকি শুনেছেন। তাই বলি একবার সঠিক জেনে আসি।'

অগত্যা বলতে হ'ল কথাটা। মধুবাবুর জেরায় সবই জানাতে হ'ল—হারানোর পূর্ণ বিবরণ।

'সর্বনাশ! হারানো কি বলছেন। এ তো চুরি। চুরি করেছে মশাই। নাকে ক্লোরোফরম্ বা অমনি কিছু দিয়ে অজ্ঞান ক'রে নিয়ে গেছে, কিংবা তোমার কাকু দাঁড়িয়ে আছে—গাড়ি নিয়ে এসেছে—এমনি কিছু বলেছে। তার পর মুখ চেপে ধরে জোর ক'রে কোন গাড়িতে তুলেছে।···শুনেছি হিপনোটাইজ ক'রেও নিয়ে যায় অনেক সময়। মনে আছে—একটা ষোল বছরের ছেলে কলকাতা থেকে উধাও হয়, তাকে বর্ধমান ইষ্টিশানে পাওয়া গেছল? কিছুই বলতে পারে না কি ক'রে এল সেখানে! এ একটা বিরাট গ্যাঙ হয়েছে মশাই।···তা হারিয়েছে তো কলকাতায়—না কি? কোথায় থাকত এরা?'

'এরা বোঁদেলের কাছে থাকত।' নলিনাক্ষকে বলতে হয়। ভাল লাগছে না কারুরই এই সব বকবকানি, কিন্তু উপায়ই বা কি? —'হারিয়েছে ইস্কুল থেকে, মানে ইস্কুলে এসেছিল, পুরো ক্লাসও

করেছে। ইস্কুলটা ওর বালিগঞ্জে—দেশপ্রিয় পার্কের কাছে।'

'তাহলে সে এখনও কলকাতাতেই আছে হয়ত। হৈ চৈ খোঁজ-খবরটা যাকে বলে, থিতিয়ে না গেলে ওরা বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে না। জানে তো এখন চারদিকে চোখ রেখেছে পুলিস। লুকিয়ে রাখতে গেলে মশাই নিরাপদ জায়গা এই কলকাতাই। আপনি যান নলিনবাবু, আপনি গেলে কাজ হবে।···অতবড় কাগজে তো কাজ করেন—দিন খানকতক চিঠি ছেপে, নামে বেনামে—দেখেন না, একজন এক কলম লিখলেন অমনি তার পোঁ ধরে পঁচিশখানা চিঠি অমনি ছাপা হয়ে গেল! কার এত গরজ মশাই? ওসব ঐ আপিসে বসেই লেখা হয়, ওসব আমাদের জানা আছে। তা আপনিই বা সে য়্যাডভাণ্টেজ নেবেন না কেন? চিঠি ছাপুন, কলম লিখুন, এডিটোরিয়াল লেখান—ঠিক পুলিসের টনক নড়বে। বড় খবরের কাগজকে মশাই বোধ হয়, ভগবান কেন—ভূতও ভয় করে। হ্যাঁ—যা বলছি, ভেবে দেখুন। কাগজ—ওবড় সাংঘাতিক জিনিস।'

আশ্চর্য! কাল থেকে নলিনাক্ষও ঠিক এই কথাগুলোই ভেবেছে। মধুবাবুকে প্রথম প্রথম যতটা 'ফোরটোয়েন্টি' সব-জান্তা দাদা মনে হ'ত—এখন তো ততটা মনে হচ্ছে না। জানেন অনেক কিছুই। কী করেন কে জানে। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'কী করি? কি না করি তাই বলুন। যখন যা পাই—দু পয়সা রোজগারের ধান্ধা। জ্যাক অফ অল ট্রেড মাস্টার অফ নান—সেই অবস্থা আর কি!'

অবশ্য সে সব কথা এখন আর উঠিয়ে লাভ নেই। নলিনাক্ষ বলল, 'আমিও তো আজই যেতে চাই। কিন্তু টিকিট? যা ভাড় এখন চেঞ্জারবাবুদের। রিজার্ভেশ্যন পাওয়া যাবে সত্ত সত্ত?'

মধুবাবুর অদম্য উদ্যম। বললেন, 'চলুন না দুজনেই স্টেশনে যাই। গিয়ে সিচুয়েশ্যনটা বুঝিয়ে বলি স্টেশন মাস্টারকে। তাতেও না পান—একটা রাত না হয় আনরিজার্ভড্ কামরাতেই চলে যাবেন। কী হয়েছে, ইয়ংম্যান্, দাঁড়িয়ে গেলেই বা কি ক্ষেতি? সন্ধ্যের

বাস হয়েছে একটা—তাতেও যেতে পারেন। তাতে অবিশ্যি বসে যেতে পারবেন।'

সত্যিসত্যিই তিনি একরকম টানতে টানতে নিয়ে গেলেন স্টেশনে। বিশেষ সুবিধে হ'ল না। রিজার্ভেশ্যন ক্লার্ক ঘাড় নাড়লেন। কোন বার্থ এমন কি সীটও নেই। মধুবাবু তাতে দমবার পাত্র নন, হুড়মুড় ক'রে স্টেশন মাস্টারের ঘরে ঢুকে গেলেন। বেশ একটু উত্তেজিত ভাবে ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে একটা লেক্‌চার দিলেন—যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ যখন একটা জীবনমরণ সমস্যা, তখন তাঁদের উচিত অন্য কারও রিজার্ভেশ্যন ক্যানসেল করিয়ে নলিনাক্ষকে দেওয়া।

স্টেশন মাস্টার খুব সহানুভূতি জানালেন, কিন্তু তাতে আসল কাজের কিছু হ'ল না। বললেন, 'দিন-কাল বড় খারাপ পড়েছে, কোথায় কোন্ প্যাসেঞ্জারকে বঞ্চিত করব—সে হয়ত দেখুন কোন্ রাজ্যের কোন্ মিনিস্টার কিংবা এম. এল. এ'র আত্মীয়। এক কথায় আমার সাজা হয়ে যাবে। আমার এক বন্ধু মশাই, বাবুলাল, সে জেনে শুনে মিছে বলে নি, দেখতেই ভুল হয়েছিল, এক প্যাসেঞ্জারকে বলে দিয়েছে স্লীপার বার্থ খালি নেই, তারপর বুঝি সেই প্যাসেঞ্জারেরই চেনা কে এসে পেয়েছে—এই কেস। লোকটি বুঝি কোন্ মিনিস্টা-রের কে, সইয়ের বৌয়ের বকুলফুলের বোনপো বোয়ের বোনঝি-জামাই, এক কথায় ডিমোশান হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্‌সফার—লোকটার কেরিয়ারটাই ডুমুড়্।...না, সে সব পারব না। দেখি লাস্ট মোমেণ্টে যদি কেউ আসে ফেরত দিতে, আমি আপনাকে খবর পাঠাব।'

তিনি সামনের ব্লটিং প্যাডে নলিনাক্ষর নাম ঠিকানা লিখে নিলেন।

মধুবাবুর উৎসাহ কিন্তু তবুও স্তিমিত হ'ল না। তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, 'না মশাই, এ কোন কাজের কথা নয়। উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ, যা হোক একটা জোড়াতালি দিয়ে বুঝিয়ে দিলে আমাদের। চলুন একবার বাসটা দেখে যাই—'

বাস-এ সীট ছিল। তবে রিজার্ভ করতে চাইল না। আসলে ওরা

নাকি এত আগে রিজার্ভ করে না। সাতটায় বাস ছাড়বে, পৌঁছোবে সকাল ছটায়। ছাড়বার এক ঘণ্টা আগে টিকিট দেওয়া হয়। যারা আগে এসে 'কিউ' দেবে তারাই পাবে।

সেই মতোই চলে আসছিল নলিনাক্ষ, না হয় চারটেতেই আসবে বাস-স্ট্যাণ্ডে—কিন্তু মধুবাবু ছাড়বার পাত্র নন। অনেক বড় বড় বুলি ছেড়ে, স্পেশ্যাল কেস, এই রকম ক্ষেত্রে আইন শিথিল করা উচিত বুঝিয়ে দিয়ে—তারপর, এসব মন্ত্রেও যখন কাজ হ'ল না, তখন মধুবাবু ব্রহ্মাস্ত্রটি ছাড়লেন। 'কতবড খবরের কাগজে কাজ করে তা জানেন? এডিটার। সম্পাদকীয় লেখেন। জরুরী কাজ, যদি আপনারা একটু কো-অপারেশন মানে সহযোগিতা না করেন—পরে পস্তাবেন। উনি হুড়ো দিলে তখন দেখবেন কলকাতা ভুবনেশ্বরের গভর্ণমেণ্ট আপনাদের নভুতো নছুতো করবে!'

তাতেই কাজ হ'ল। মধুবাবু নিজের পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার ক'রে জমা দিয়ে দিলেন. কথা রইল ছটার মধ্যে এসে বাকী টাকা জমা ক'রে দেবে নলিনাক্ষ।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা করতে হ'ল না। চারটের সময় স্টেশন থেকে পোর্টার এল, 'এখনই কেউ টাকা নিয়ে আসুন—একটা স্লীপার বার্থ পাওয়া গেছে।'

এ খবরটা আর মধুবাবুকে দিল না নলিনাক্ষ। এতক্ষণের সাহচর্যেই অস্থির হয়ে উঠেছে। ভারী নাছোড়বান্দা লোকটা, সব দিক দিয়েই। যেন কাঁঠালের আঠার মতো গায়ে লেপ্‌টে থাকে। আর—উনি যা বলবেন তাই করতে হবে, আর কেউ যেন কিছু বোঝে না! সেইটেই আরও অসহ্য। ওয়েলমিনিং হয়ত—কিন্তু ওয়েলমিনিং ফুল।

ভাগ্যিস শেষ মুহূর্তে ট্রেনের ব্যবস্থাটা হয়ে গেল। পরের দিন আপিসে গিয়ে খবর পেল পুরী থেকে কলকাতা আসার নাইট-বাস ভদরকের কাছে য়্যাক্সিডেণ্টে পড়েছে। কে বা কারা এক জায়গায় রাস্তায় খানিকটা খুঁড়ে রেখেছিল—সেটা একটা বাঁকের মুখ, একেবারে

সামনে গিয়ে পড়ে সেটা দেখতে পায় ড্রাইভার, তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে পাশে ধানের ক্ষেতে গড়িয়ে পড়ে যায়। তিনজন মারা গেছে, এগারোজন জখম—তার মধ্যেও তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মনে হচ্ছে জগন্নাথই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, স্টেশন মাস্টারের শুভবুদ্ধির উদ্রেক করিয়ে।

॥ ৬ ॥

বাড়ি ফিরে স্নানাহার সেরে একটু সকাল সকালই আপিসের দিকে রওনা দিল নলিনাক্ষ। এখন গিয়ে অনেক কিছু করতে হবে—ম্যানিপুলেশ্যন যাকে বলে। দোলাকে যদি বাঁচাতে হয়—মৃত্যু বা তারও অধিক শোচনীয় ভাগ্যের হাত থেকে—তাহলে এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে পুলিসকে আরও সক্রিয় ক'রে তোলা। আর তা করতে হ'লে খবরের কাগজে 'আন্দোলন' করা ছাড়া কোন উপায় নেই। দেবীপদ সব জেনেছে ঠিকই, কিন্তু তারও নিজস্ব কাজ আছে—খুবই বিপজ্জনক কাজ, তার কথার ভাবে যা মনে হ'ল—সে আর এদিকে কতটুকু মনোযোগ দিতে পারবে?

বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে—দেখল সামনেই মিঃ চাকলাদারের গাড়ি—গাড়িতে মালিক স্বয়ং। সেটাও ছাড়ছে তখন।

একটু অবাকই হ'ল নলিনাক্ষ। তার পরই মনে পড়ল সেদিনের কথা। গাড়িটা বেরিয়ে চলে আসা। ঠিক তো—কাল তো একবারও চোখে পড়ে নি। তার মানে তখনই কলকাতা ফিরেছে।

চোখোচোখি হ'তে বলল, 'এ কি, আপনি? পুরী থেকে চলে এসেছেন বুঝি? কবে এলেন টের পেলুম না তো।'

'না না,' ভদ্রতার প্রতিমূর্তি মিঃ চাকলাদার সৌজন্যে গলে গেলেন যেন, 'সেভাবে এলে আপনাকে বলে আসতুম বৈ কি। মাই ফ্যামিলি ইজ স্টিল দেয়ার। আমি একটা জরুরী কাজে এসেছিলুম। এই

এখনই আবার ফিরে যাচ্ছি। তা আপনি যে এরই মধ্যে ফিরলেন ?'

বলতে গিয়েও কারণটা বলল না নলিনাক্ষ। বলল, 'আমার অল্প দিনেরই মেয়াদ ছিল। আজ আপিসে জয়েন করতে যাচ্ছি। অবিশ্যি বৌদিরা এখনও থাকবেন কিছুদিন।'

আপিসে গিয়ে অনেক কাজ করল। ওর ওই বিপদের কথা শুনে সকলেই যথেষ্ট আনুকূল্য করল। তিন-চারজনে বসে তিন-চার-খানা চিঠি লিখে ফেলল, সেগুলোর লেখকের নামটামও দিয়ে দিল নিজেরাই। ওদের যে সাপ্তাহিক, তার সম্পাদককে বলতে তিনি এই নিয়ে একটা ফীচার করবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। নলিনাক্ষ নিজের কলমেও লিখল। সেদিন সম্পাদকীয় যাঁর লেখবার কথা, বরুণ চক্রবর্তী, তাঁকেও অনুরোধ ক'রে এল। তিনি বললেন, 'আজ যদি নাও যায়, কাল ঠিক যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

সকাল সকাল আপিসে গিছল কিন্তু সকাল ক'রে ফেরা হ'ল না। দু-একটা টেলিফোন সেরে—সে খবরটা কোনমতে দাদাকে পাঠানো যায় যাতে, সে ব্যবস্থা করতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে দেখল বাইরের ঘরে এক কনস্টেবল্। দেখে অবাকও যেমন হ'ল একটু আশাও জাগল মনে। তা'হলে কি কোন খবর পাওয়া গেছে দোলার ?

'কী ব্যাপার বলো তো ? কোন্ থানা থেকে আসছ ?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে লোকটা বলল, 'আপনার নামই তো নলিনাক্ষবাবু ?'

'হ্যাঁ—কেন ? কোন খবর আছে ?'

হাতের তালুটা এতক্ষণ আধমুঠো করা ছিল সিপাইটির। সে এবার সেটা মেলে ধরল ওর সামনে, তাতে নলিনাক্ষরই একখানা ছোট ফটো।

মুখে বলল, 'দেবীবাবু আজ রাত বারোটার সময় কলকাতা পৌছবেন। আপনাকে একবার ওঁর আপিসে যেতে হবে সেই সময়। উনি গাড়ি পাঠাবেন, ড্রাইভারের কাছে এই ফটো থাকবে, দেখে তবে

সে গাড়িতে উঠবেন।'

'দেবীবাবু—হঠাৎ?'

'তা জানি না। আমার ওপর যেটুকু হুকুম হয়েছে—আমি জানিয়ে গেলাম। তবে যা শুনলুম, আন্দাজ হয় আপনারই কোন কাজে যাওয়া নাকি দরকার। নমস্কার।'

মুখে নমস্কার বলেও স্যালিউট ক'রে চলে গেল সে—পলিসী কেতা-মতো।

লোকটা চলে যেতে নলিনাক্ষ দরজা বন্ধ ক'রে ভেতরে এসে বসল। আশাও একটু হচ্ছে বৈ কি।

দেবীবাবু যদি ওর কাজেই আসছে বলে থাকে—তাহলে দোলার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। তার আর অন্য কি কাজ?…কিন্তু দেবীপদ এখানে না এসে ওখানে ডেকে পাঠাল কেন? আপিসেই বা ওকে ডেকে নিয়ে যাবার কি দরকার? কাউকে সনাক্ত করতে হবে?

ওদের কম্‌বাইন্‌ড্‌-হ্যাণ্ড রঘু চা দিয়ে গেল। 'আউর্‌ অ কঁড খাইবে বাবু' প্রশ্ন করল। 'কিছু খাবে না' শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে রান্না-ঘরে ফিরে গেল আবার।

চা খেতে খেতে মনে পড়ল পুরীতে একখানা চিঠি লেখা দরকার—টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে বটে—তবে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া যায় নি কিছু—কী কী করেছে সে, কতদূর—। তার চেয়েও যেটা দরকার ব্লেড্‌ নেই একখানাও। তাড়াতাড়ি আসার সময় ব্লেডের প্যাকেটটাই আনা হয় নি। আগে সেটা আনাতে বা আনতে হবে। নইলে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে এখনই, কাল আটটার আগে পাওয়া যাবে না। এই এক উৎপাত হয়েছে আজকাল, সাড়ে সাতটা না বাজতে বাজতে ঝাঁপ ফেলা শুরু হয়ে যায় দোকানে দোকানে। তবু ওদের মোড়ের দোকানটা দোর ভেজিয়ে সাড়ে নটা পর্যন্ত বেচা-কেনা করে, তাই রক্ষা।

অন্য দিন হলে রঘুকে পাঠাত। কিন্তু বৌদিরা কেউ নেই, রঘুই রান্না করছে। যেতে হলে ওকেই যেতে হবে। ভাগ্যে ধরাচুড়ো

ছাড়ে নি এখনও। বাইরের কাজটা সেরে এসেই একেবারে জামা প্যাণ্ট ছেড়ে স্নান ক'রে নিশ্চিন্ত হবে—

ব্লেড কিনে ফিরছে, অন্ধকারে একটা গাড়ির আলো এসে পড়ল সামনের বড় রাস্তায়—বহুদূর পর্যন্ত। আর তাতেই চোখে পড়ল আগে আগে যাচ্ছে চাকলাদারের বড় গাড়িখানা—যেটা আজই পুরী চলে যাবার—এবং এতক্ষণে সেখানে পৌঁছে যাবার কথা।

তবু সন্দেহ থাকতে পারত একটু—কিন্তু পিছনের গাড়িখানা আর একটু এগিয়ে গেছে। আরও জোর আলো গিয়ে পড়েছে সামনের গাড়িতে। না, ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সেই গাড়িই। এমন কি ভেতরে পরেশ চাকলাদারের টাকাভর টাকটাও দেখা যাচ্ছে দিব্যি।

সকালেই যে পুরী যাচ্ছিল সে এখনও এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তার মানে যাওয়ার কথাও ছিল না, ইচ্ছাও না। জেনেশুনেই মিছে কথা বলেছে লোকটা।

না, লোকটার চালচলন ক্রমশই যেন কেমন কেমন হয়ে উঠছে।

বৌদির ধারণা দেখা যাচ্ছে একেবারে অমূলক নয়। মেয়েরা মানুষ চেনে অনেক বেশী সহজে, নিজেদের সহজ বুদ্ধিতে চেনে বলে চেনাটাও সোজা—পুরুষেরা অনেক বিবেচনা ভদ্রতার পাকে বাঁধা থাকে বলেই দেরি হয়।

কিন্তু বাড়ির দরজা পর্যন্ত এসে ওর একটা খটকা লাগল। গাড়ির নম্বরটায় তখন তত নজর দেয় নি, মনেও হয় নি কথাটা—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এটা চাকলাদারের সে গাড়ির নম্বর তো নয়। তবে কি সে ভুলই দেখল? পরেশবাবুর গাড়ি নয় ওটা?…তাই বা কেমন ক'রে হবে! ডান দিকে ঐ যে একটু রং-ওঠা দাগ, মিঃ চাকলাদারের টাক—সবই তো মিলে যাচ্ছে। নম্বরটাই হয়ত কি দেখতে কি দেখেছে। অত তাড়াতাড়ির মধ্যে, তাছাড়া নজরটা ছিল আরোহীর দিকেই—।

বাড়ি ফিরে স্নান ক'রে ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে বসতেই যেন রাজ্যের ঘুম জড়িয়ে এল চোখে।

চোখেরও অপরাধ নেই, কাল রাত্রে ট্রেনে একটুও ঘুম হয় নি। স্লীপার নামেই, সারারাত দুটি মহিলা বকর বকর করতে করতে এসেছেন, নিজেদের বাপের বাড়ির ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি, জামাইরা মেয়েদের কত বাধ্য, আর বৌগুলো ছেলেদের পর ক'রে নিচ্ছে—মোটামুটি এ-ই বক্তব্য। এছাড়া একজনের ছেলের অসুখ; বাচ্ছাটা সারারাত কেঁদেছে প্রায়।

একটা লোক—বোধ হয় তার ঘুম হয় না রাত্রে—প্রত্যেক স্টেশনে দরজা খুলে নামছিল। কোন কিছুই কেনার নেই। দেখারও না, অত রাত্রে কীই বা দেখবে? অথচ ট্রেন থামামাত্র সে এত ব্যস্ত হয়ে নামছে, যেন কী প্রচণ্ড দরকার। পাছে অবাঞ্ছিত কেউ উঠে পড়ে সেই ফাঁকে—নলিনাক্ষকেই ঘাড় তুলে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছিল, কারণ তারই ভয়ের কারণ ছিল—দেবীপদর সতর্কবাণী তামাশা কিনা সেটা তো ঠিক বুঝতে পারছে না। এই ভাবেই কেটেছে সারা রাত, তার ওপর আজ সকাল থেকে একটানা নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে, বিশ্রাম দূরে থাক এক মিনিট স্থির হয়ে বসতে পারে নি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল নটা বেজে গেছে। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে—স্থির হয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই। যতক্ষণ মানসিক উত্তেজনা আর উদ্বেগ ছিল, সেই টানে কাজ ক'রে গেছে, এখন মনের রাশ একটু আলগা হতেই স্নায়ু শিথিল হয়ে আসবে—সেটা স্বাভাবিক। এর ওপর পেটে খাবার পড়লে আর কোনমতেই জেগে থাকা যাবে না।

ঘুমনো উচিতও—কিন্তু ঐ এক ঝঞ্ঝাট রইল, রাত বারোটায় দেবীপদর গাড়ি। গাড়ি কেন তাও তো বোঝা যাচ্ছে না। তাকে বললে সে-ই তো যেতে পারত।…কী যে ব্যাপার—সত্যিই কি তার এত বিপদের ভয় আছে? নইলে ড্রাইভার ছবি দেখালে তবে সে গাড়িতে উঠবে—এত সাবধান হবে কেন দেবীপদ? আশ্চর্য! সে কার কি

অনিষ্ট ক'রে বসল এত যে, তার প্রাণ নেবার জন্যে এত আয়োজন চলছে! দেবীপদর আবার একটু বেশী বাড়াবাড়ি—

তন্দ্রায় দেহের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিগুলোও শিথিল হয়ে আসছে। চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তাই। আধ ঘুমে আধ সচেতনতাতেই দেবীপদর সতর্কতা থেকে মনটা চলে গেল ছবিখানায়। সিপাইর হাতের ছবি। কবেকার ছবি। খুঁজে বারও করেছে বটে দেবীপদ—

অকস্মাৎ যেন একটা ইলেকট্রিক শ্যক খাওয়ার মতো কথাটা আঘাত করল ওকে। মুহূর্তে মনটা সক্রিয় হয়ে উঠল আবার। সোজা হয়ে উঠে বসল চেয়ারে।

সত্যিই তো, এ ছবি দেবীপদ কোথায় পেল? নলিনাক্ষর নিজের কাছেও তো নেই। একটা স্টুডিওতে তোলা। ও আর ওর এক বন্ধু সুরঞ্জন, একসঙ্গে তুলেছিল। সুরঞ্জনই টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তার কে এক আত্মীয়র স্টুডিও, তারই শখ নলিনাক্ষর সঙ্গে ছবি তুলে রাখবে।

স্টুডিওতেই ছিল এক কপি, সেটা মনে আছে, অনেক ছবির সঙ্গে একটা শো-কেস মতো ফ্রেমে বাঁধানো, ওদের কৃতিত্বের নমুনা-স্বরূপ। এমন কিছু ছবি না, সুরঞ্জনের আগ্রহে ও অনুরোধেই তাঁরা টাঙিয়ে রেখেছিলেন। ওকেও দিয়েছিল সুরঞ্জন এক কপি, সে কোথায় কবে হারিয়ে গেছে, খেয়ালও নেই।

ছবিটা মনে পড়ছে ঐ জামাটার জন্যে। বড় বড় স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট, মা কিনে দিয়েছিলেন, তারই পছন্দ করা। তাঁর জীবদ্দশায় ওর জন্য ঐ শেষ জিনিস কেনা তার। জামাটা তারপর বৃন্দাবনে বানরে ছিঁড়ে দেয়, ওর খুব আঘাত লেগেছিল তাতে, মায়ের স্মৃতিটা নষ্ট হয়ে গেল বলে।

সেই নেগেটিভ থেকে সুরঞ্জনকে বাদ দিয়ে কেউ ছবিটা প্রিন্ট করিয়েছে। নেগেটিভটা তারা এখনও রেখে দিয়েছিল তার মানে। কিংবা ছবিটা থেকেই কেউ নতুন ক'রে নেগেটিভ করিয়েছে—

কিন্তু দেবীপদ এত কাণ্ড করতে যাবে কেন?

পরশুই তো তার সঙ্গে দেখা হ'ল। সে তো কখনও ওর কাছে ছবি চায় নি। এত কাণ্ড করার কি দরকার ছিল। এসব করলই বা কবে?

আর—আবারও বিদ্যুৎচমকের মতোই মনে পড়ে গেল, দেবীপদই তো গত বছরে ওর ছবি তুলেছে একখানা। তার কপিও দিয়েছে, বেশ ভাল ছবি। সেটা না পাঠিয়ে এত ক'রে এ ছবি যোগাড় করার মানে কি?

না, ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে।

তবে কি দেবীপদর আশঙ্কাটাই ঠিক? এটাও ওকে ধরে নিয়ে যাওয়ারই একটা ষড়যন্ত্র?

শুধু দেবীপদর নাম করলে যদি ওর সন্দেহ হয়, তাই আর একটু বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলা? বেশী আটঘাট বাঁধবার চেষ্টা—এত কাণ্ড ক'রে একটা ফটো যোগাড় করা!

এই 'বেশী'টাই ভুল হয়ে গেল ওদের। জামাটা যে চিনতে পারবে, অত হিসেব করে নি।

ঘুম ছুটে গেল একেবারেই। খাওয়াদাওয়ার পর হাত পা মেলে বিছানাতেই শুয়ে পড়ল, কিন্তু তখন আর কিছুপূর্বের সে তন্দ্রার জড়তা কি ক্লান্তির লেশমাত্র নেই। একটা বই পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তার একটা বর্ণও মাথায় ঢুকল না। ওর বিপদটা যে সত্যি—দেবীপদর কল্পনা নয়—এইটে বুঝে উত্তেজনা ও অস্বস্তি, সেই সঙ্গে একটু যেন নিজের সম্বন্ধে একটা বর্ধিত মূল্যবোধ—ইংরেজিতে যাকে বলে 'সেনস্ অফ সেল্ফ্ ইম্পর্টেন্স'ও বোধ করছে। সে অবস্থায় ঘুমনো কি অন্য কিছুতে মন দেওয়া সম্ভব নয়।

॥ ৭ ॥

এমন কি সেই তথাকথিত পুলিস-গাড়ি চলে যাবার পরও ঘুমোতে পারল না আর। কেমন যেন একটু ভয়-ভয়ও করতে

লাগল—গা-ছমছম করা যাকে বলে।

ভাল ক'রে দরজা জানলা বন্ধ ক'রে দিলে নিজে হাতে, ছাদের দোর, সদর দরজা ভেতর থেকে তালাবন্ধ করল। নিজের ঘরের দরজাও বন্ধ ক'রে তাতে একটা ভারী চেয়ার ঠেকিয়ে রাখল, যাতে কেউ বাইরে থেকে কোন কৌশলে খিলটা খুলে নিঃশব্দে না ঘরে ঢুকে পড়তে পারে। সকাল হ'লে রাত্রের এই ভয় পাওয়ার কথা মনে পড়ে লজ্জা করবে—তা জানে, কিন্তু এখন এই ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে যে বিন্দুমাত্র ঘুমের সম্ভাবনা থাকবে না, সেও সত্যি। সহজ সত্যকে সোজাসুজি মেনে নেওয়াই ভাল।

গাড়ি ঠিক রাত বারোটায় এসেছিল। একজন পুলিসের উর্দিপরা ড্রাইভার এসে দরজার বেল টিপে স্যালিউট ক'রে দাঁড়িয়েছিল, তার হাতে সেই ছবি। নলিনাক্ষ যথেষ্ট অমায়িক ভাবেই তাকে এসে ভেতরে বসতে বলেছিল। ইচ্ছে ছিল ভেতরে ঢুকলেই দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে পুলিসে খবর দেবে। সি. বি. আই. অফিসেও খোঁজ করবে দেবীপদ এসেছে কিনা।

কিন্তু ড্রাইভারটি খুব হুঁশিয়ার, বোধ হয় এ সমস্ত পরিস্থিতি অনুমান ক'রেই তাকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছিল। সে আর একটা স্যালিউট ক'রে বলেছিল, 'আজ্ঞে না, গাড়িতে কেউ নেই, গাড়ি ছেড়ে যাবার হুকুম নেই আমাদের। আমি আপনাকে জানিয়ে দিয়ে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব—এই রকম ইন্‌স্ট্রাকশ্যন্ আছে আমার ওপর।'

তখন ভদ্রভাবেই বলতে হয়েছিল নলিনাক্ষকে, 'আমার শরীর খুব খারাপ, এত রাত্রে যেতে পারব না। সেই কথাটাই জানিয়ে চিঠি লিখে দিতাম। তা তুমি যখন বসতে পারবে না, মুখেই বলে দিও।'

না, লোকটা অতঃপর রিভালভার কি ক্লোরোফর্ম প্যাড্ বার করে নি, অভিনয় সম্পূর্ণ করতে আর একটা স্যালিউট ক'রে চ'লে গিছল শুধু।

আরও সেই জন্যেই ঘুম আসে নি চোখে। কে এরা, তাকে

জালে জড়াতে চায়, কী এদের মতলব, কতদূর পর্যন্ত তারা যেতে প্রস্তুত—সত্যিই তাকে খুন করবে কিনা। এই সব এলোমেলো গা-সিরসির-করা চিন্তাতেই রাত কেটে গিছল।

সকালবেলার জন্য আর একটি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

চা খেয়ে দাড়ি কামিয়ে স্নান করতে যাবে—ইদানীং-অতি-পরিচিত একটি কণ্ঠের ডাক এসে পৌঁছল, 'ভাই নলিনাক্ষবাবু বাড়ি আছেন নাকি? আমি মধুসূদন সমাদ্দার।'

অগত্যা দোর খুলে অভ্যর্থনা জানাতে হ'ল। তবে খুশী যে হ'ল না কিছুমাত্র, সেটাও মুখভাবে গোপন করার চেষ্টা করল না। শুষ্ক বিরস কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'আপনি হঠাৎ? হাতে ব্যাগ, স্টেশন থেকে সোজাই নাকি?'

ওর মুখভাবের বা কণ্ঠের বিরসতার মতো তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাবেন, মধুবাবু তেমন দুর্বলচিত্ত মানুষ নন। ঘরে ঢুকে ব্যাগটা সাবধানে এক পাশে রেখে একটা চেয়ারে বসে পড়ে 'ফোঃ' ক'রে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন, 'আর বলবেন না। আপনার বৌদি যা কান্নাকাটি করছেন, আর স্থির থাকা যায় না।···হ্যাঁ, স্টেশন থেকে সোজাই, অন্য কোন কাজ তো ছিল না। শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করতেই—আজই আবার ফিরব—হেঁ হেঁ, ও ব্যাগে একটা গামছা লুঙ্গি, একখানা বিছানার চাদর আর একটা ফুলনো বালিশ—হেঁ হেঁ, একটু চা বলুন বরং, সোজাই আসছি তো—আজকাল এত ভোরে পৌঁছয়—পথেও কোথাও দাঁড়ায় না গাড়িখানা, চা-ফা আর জোটে নি—'

'তা বৌদিই বা পাঠালেন কেন? আপনি এসে আর কি করবেন? এত দিনে যা কেউ পারল না, আপনি এসে তাই ক'রে দেবেন?'

বিরক্তিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আরও।

'না না। পাগল, তাই কথনও পারি। হেঁ হেঁ, এ তো আর ম্যাজিক নয় যে টুপির মধ্যে থেকে মেয়েটাকে বার ক'রে দেবো!

না না, বৌদিও পাঠান নি ঠিক। ইন্ ফ্যাক্‌ট্ আমিই এসেছি। আসলে আমি বড় টেণ্ডার-হার্টেড—বুঝলেন না, মেয়েদের কান্না-কান্না— ।'

একটু অপ্রতিভভাবে হাসলেন মধুবাবু। কিন্তু তখন নলিনাক্ষর হাসিও ভাল লাগছে না। বিশেষ তার তখন মনে হচ্ছে সবটাই কৃত্রিম। সে আবারও তেমনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আসল প্রশ্নে ফিরে এল, 'তা আপনি কি করতে চান এখন? আপনার কোন প্ল্যান আছে?'

'কিছু না। কিছু না। আমার এমন কি বিদ্যাবুদ্ধি বলুন যে আপনারা এত মাথা-মাথা লোক যা পারছেন না, আমি অমনি একটা চটপট প্ল্যান বাৎলে তাই করব, আপনাদের ওপর টেক্কা দেব! ...আমি জাস্ট—যদি কিছু না মনে করেন, একটা টিপ্‌স্ দিতে চাই। বেনেপুকুর এরিয়া জানেন তো? কখনও গেছেন? ঐ যে গ্যাস-ক্রিমোটারিয়ামটা আছে—পার্ক সার্কাসেরই দিকটা আর কী—যান নি কখনও? ধ্যুস্ মশাই, গেছেন নিশ্চয়, খবরের কাগজে কাজ করেন, সাহিত্যিক লোক—কত ঘোরেন।...ঐখানে কিছু ট্যাঁশ ফিরিঙ্গি আর মুসলিম ব্রাদারদের বাস। আছে বৈকি, ভাল লোকও বিস্তর আছে, যত ভাল মিস্ত্রী সবই তো ঐখানে। খুব বিশ্বাসী আর বিশ্বস্ত—তা নয়, ঐখানেই কোথাও মশাই এই ছেলে চালানের কারবার হয়, আমি জানি। পারেন একটু তলে তলে খবর নিতে? মানে খবর যে নিচ্ছেন তা যেন না কেউ জানতে পারে। গোখরো সাপ নিয়ে খেলা, মনে রাখবেন—'

অসহিষ্ণুভাবে তাঁর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে নলিনাক্ষ বলল, 'এ খবরটা আপনি জানেন, অথচ পুলিস জানে না? আশ্চর্য তো!'

কণ্ঠের ব্যঙ্গটা প্রচ্ছন্ন থাকে না বলাই বাহুল্য।

'ঐ তো ব্রাদার! অবিশ্বাস করছেন, ভাবছেন আমি গুল ঝাড়ছি। আরে মশাই, মহাভারত পড়েছেন? ইট্‌স্ এ গ্রেট বুক। পৃথিবীর আর কোন ভাষায় লেখা হয় নি এমন বই—হোলি স্যাংস্ক্রীটে যা হয়েছে—পড়েছেন তো? চক্রব্যূহ ক'রে কৌরবরা রেডী—এসো লড়ে যাও কে আসবে, বেগতিক দেখে অর্জুন ভায়া সরে পড়েছেন

একদিকে—তা হোক, বলি এদিকেও তো মহা মহা রথীরা ছিল, কৈ, কেউ পারল? শেষে কার শরণাপন্ন হ'তে হ'ল—না অভিমন্যুর, এ মিয়ার ল্যাড অফ সিক্সটিন! দো ম্যারেড—হি'জ নাথিং বাট এ বয়। তাই না? করেক্ট্ মি ইফ আই য়্যাম রং। বলুন ঠিক কিনা?'

'তা বেশ তো, পুলিসকেই এ সাজেসশ্যনটা দিয়ে আসি।'

'ক্ষেপেছেন। পুলিসের চোদ্দগুষ্টিকে চেনে ওরা। সাদা পোশাকেই যাক আর খাকিতেই যাক,—পুলিস ও পাড়ার ত্রিসীমানার মধ্যে গেলেই ভোজবাজির খেলা হয়ে যাবে—উপাও। স্রেফ ইভা-পোরেট করবে। বুঝলেন না?…না না, এ হ'ল লখীন্দরের আয়রন রুম, সরু সুতোর মতো সেঁধুতে হবে, বড় বড় কেউটে গোখরোর কাজ নয়। বলি পড়েছেন তো বেউলোর ফেব্‌ল্‌স্?…মনে আছে পরীক্ষিতের কথা—এগেন আই রেফার টু দ্য গ্রেট বুক—চার-দিকে কড়া পাহারা, ফলের মধ্যে ঢুকে বসেছিল তক্ষক, কে ধরবে? …না মশাই, শিশুর মতো ইনোসেণ্ট অথচ ইনকুইজিটিভ—এইভাবে য়্যাপ্রোচ করতে হবে। পুলিস-ফুলিসের কম্ম নয়, পারলে আপনি পারেন। কাউকে বলবেন না। জানাবেন না। মনসা চিন্তিতং কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ—চন্দ্রগুপ্ত নাটক দেখেছেন? গ্রেট ম্যান চাণক্য—তারই কথা। মন-মন-কাজে খোঁজ করতে শুরু করুন। তবে ঐ যা বললুম, খুব সাবধান। ডেঞ্জারাস গ্যাঙ। সাপের চেয়ে সাংঘাতক। শুনেছি ওর মধ্যে ইংরেজ আছে, ইহুদী আছে, মোসলমান, মারোয়াড়ী, বেহারী, জাপানী সব আছে। মনে রাখবেন—ইউ হ্যাড্ বীন ওয়ার্ণড্, ডোণ্ট সে দ্যাট আই ডিড নট এক্স্‌প্লেন্‌ড্ টু ইউ দ্য পসিবিলিটি অব ডেঞ্জার্‌স্।'

এবার নলিনাক্ষ একটু নরম হ'ল। লোকটা যা-ই বলুক, একটু যে জানে তাতে সন্দেহ নেই। সে বলল, 'বেশ তো, চলুন না, দুজনেই যাই?'

'আমি?' যেন আঁৎকে উঠলেন মধুবাবু, 'না মশাই, আমি ছাপোষা

লোক, জেনেশুনে ও বাঘের গর্তে পা বাড়াতে রাজী নই। বাপ রে! না না, ও কাজে আমি নেই। ইয়েস্ আই য়্যাম এ কাওয়ার্ড, স্বীকার করছি। না না, আমার গন্ধও না পায়। দোহাই আপনার—প্লীজ! উপকার করতে এসেছিলুম বলে আমার আবার নামটি ক'রে বসবেন না। কারও কাছেই না—খুব আপনার লোকের কাছেও না। বাতাসে কান পেতে থাকে ওরা। টের পেলেই গলাটি কচ্। কাট-থোট! কাটথোট! ওরা কি মানুষ? ওরা সব পারে।...

তার পর একটু থেমে, অকারণেই রুমালে মুখ মুছে নিয়ে আবারও একটা 'ফোঃ' শব্দ ক'রে বললেন, 'শোনেন নি, এই কালকের কাগজেই বেরিয়েছিল প্রতাপগড়ের কাছে এক জায়গায় একটা লোক হায়নার চামড়া পরে—? দেখেন নি? বাচ্ছাদের রক্ত বার ক'রে নিয়ে বিক্রী করত! তারপর কামড়ে খিমচে এমন ক'রে রেখে যেত—সবাই ভাবত হায়নাই মেরে রক্ত খেয়ে গেছে। দাঁতের দাগ পর্যন্ত ক'রে রাখত।...এইখেনে যতীনদাস রোডে আমার জানাশুনো এক পেয়ার—বোথ দ্য হাসব্যাণ্ড য়্যাণ্ড ওয়াইফ, দুজনেই আপিস যেত—এই এক মেয়েদের আপিস করা হয়েছে মশাই, হোম লাইফ ফ্যামিলি লাইফটাই নষ্ট হয়ে গেল—হ্যাঁ, যা বলছিলুম, বাচ্ছাটা থাকে ঝিয়ের কাছে, দিন দিন রোগা হয়ে যায়। এরা বোঝে না, কেবল ভাল ভাল টনিক খাওয়ায়, খাবার খাওয়ায়—কিছুতেই কিছু হয় না। শেষে পাড়ার এক তেতলা বাড়ির ছাদ থেকে এক বুড়ী লক্ষ্য ক'রে যে—এরা বেরিয়ে গেলে দু-একদিন অন্তর এসে রক্ত বার করে নিয়ে যায়, বিক্রী করে। সামান্য কটা টাকার জন্যে—কী পিশাচ এরা ভাবুন তো! কাইণ্ড-হার্টেড—চোর-ডাকাতেরা এদের কাছে মহাপুরুষ! আমেরিকায় শুনেছি আগে এক রক্তচোষা বাদুড় ছিল, তা তাদের খাদ্যই ঐ, এরা মশাই টাকার লোভে—বুঝলেন না। এরা আরও খারাপ, আরও খারাপ।'

'তা জেনেশুনে আমাকে একা যেতে বলছেন?'

'সে আপনার রিস্ক। সেইজন্যেই তো সাবধান ক'রে দিচ্ছি।

হ্যাঁ, বাঘের গর্তেই পা দেওয়া, বাঘের চোয়ালের মধ্যেও বলতে পারেন। আমি কিন্তু একা পুলিস ছাড়া যেতে বলছি না। মাইণ্ড্ ইউ—তবে এও বলছি, পুলিস নিয়ে গেলে কিচ্ছু হবে না, পাত্তাই পাবেন না কারও। আচ্ছা, চলি ভাই।'

শেষ মার যাকে বলে তাই দিয়ে—এই 'শেভিয়ান' হেঁয়ালিটি ক'রে বিদায় নিলেন মধুবাবু। এতক্ষণ এত বকছিলেন বসে বসে—কিন্তু এখন উঠেই চট ক'রে ব্যাগটি হাতে নিয়ে অতি দ্রুত বাস রাস্তার দিকে চলে গেলেন, একবার ওর দিকে আর তাকালেনও না।

দরজা বন্ধ ক'রে ফিরতে ফিরতে মনে পড়ল, এসেই চা চেয়েছিলেন ভদ্রলোক, সেটাই খাওয়ানো হ'ল না।

স্নান করতেই যাচ্ছিল বটে, মধুবাবু যখন ডাকলেন, কিন্তু এখন আর সে কথা মনে রইল না। রঘুকে ডেকে এক কাপ চা দিতে বলে স্থির হয়েই বসে রইল কিছুক্ষণ।

ও লোকটা রীতিমতোই ভাবিয়ে দিয়ে গেছে তাকে।

সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষীও হ'তে পারে। এক-একজনের স্বভাব থাকে গায়ে পড়ে মানুষের উপকার করা। উপকার ক'রেই নিজের যে কিছু দাম আছে এ সংসারে, সেইটে নিজে অনুভব করে, খুশী হয়। আবার এক শ্রেণীর 'সবজান্তা দাদা' থাকেন, তাদেরও সে জ্ঞানটা লোককে জানানো দরকার, আর গায়ে পড়ে না জানালে তাদের উপায় কি ?

এও কি তাই, এই মধুসূদন সমাদ্দারের ব্যাপারটা ?

কিন্তু সেই জন্যে পয়সা খরচ করে পুরী থেকে ছুটে আসবে ? উঁহুঁ, তা সম্ভব নয়। কোন বিশেষ মতলব ছাড়া মানুষ গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে পরোপকার করে না।

সে মতলবটা কি তাহ'লে ?

ওকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া ? সেদিন উনি জোর ক'রে যে বাসের টিকিট কাটালেন, সেই বাসটাই দুর্ঘটনায় পড়ল।

কে বা কারা পাকা বাঁধানো রাস্তায় নালা কেটে রেখেছিল। ঐ বাস-টাই আসবে বলে এই কাজ করেছিল কিনা কে জানে! সাধারণ-লুটেরারা, গাড়ি বা লরী এই গাড্ডা দেখে থামলে লুটপাট করার জন্যেও করতে পারে, কিন্তু কৈ, আর তো কোন গাড়ির কোন ক্ষতি হয়েছে বলে খবর বেরোয় নি কোন কাগজে।

আবার, এই যে খবর দিতে এসেছে—হ্যাঁ, ও পাড়ায় ক্রিমিনালদের আড্ডা থাকা সম্ভব, তেমনি ওখানে সন্ধ্যার পর একা গিয়ে পড়লে, যদি তেমন কারও মতলব থাকে—সাবাড় করাও সোজা। একটা বিশেষ পাড়ার সন্ধান দিলে—চার ছাড়িয়ে টোপ ফেলার মতো—ধরার সুবিধেও হয়। হয়ত সেই জন্যেই, ঐ ফাঁদে ফেলার জন্যেই, এমন গায়ে-পড়ে খবর দিতে আসার গরজ। লোকটা হয়ত ওর সেই অদৃশ্য (এবং অকারণ, ও কার কি করেছে?) শত্রু-দলের চর।

অনেক ভাবল, অনেক তোলাপাড়া, হিসেব করল মনে মনে। যতই ভাবে ততই এই শেষের দিকের পাল্লাটাই ভারী বোধ হয়। গোড়া থেকেই লোকটাকে ভাল লাগে নি। অথচ এড়াবারও পথ পায় নি খুঁজে। খুব অভদ্রতা কি রূঢ় ব্যবহার করবে এমন অজুহাতও খুঁজে পায় নি ওর আচরণে। কিন্তু এবার যে রীতিমতোই সন্দেহজনক হয়ে উঠছে ব্যাপারটা—তাতেও কোন সন্দেহ নেই। উনি এত কথা জানলেন কি ক'রে, সেইটেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল! খুব ভুল হয়ে গেছে।

অপ্রসন্নতা ও অস্বস্তি বেড়েই যায়। ঘরের মধ্যে কোথাও বিষাক্ত সাপ আছে একটা, অথচ তাকে দেখা কি মারা যাচ্ছে না—এই অবস্থায় সেই ঘরে বাস করতে গেলে যেমন একটা সভয় অস্বস্তি থাকে—সেই রকম। অথচ কি করবে তাও ভেবে পায় না।

যথাসময়েই আপিসে গেল বটে, কিন্তু কে জানে কেন, এতটা হেঁটে গিয়ে বাস ধরতে যেন সাহস হ'ল না। রঘুকে দিয়ে ট্যাক্সি

ডাকিয়েই গেল। আপিসে পৌঁছে ধন্যবাদ দিতেই সময় কাটল। সহকর্মীরা অনেক করেছেন—চিঠিগুলো বেরিয়েছে সব, সম্পাদকীয়ও লেখা হয়েছে। ফলে একজন য়্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার দেখা করতে এলেন ওর সঙ্গে, আপিসেই। তাঁরা যে কী পরিমাণ সক্রিয় হয়েছেন—তারই একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে জানালেন, 'কলকাতার বাইরে চালান করার কোন পথ রাখা হয় নি আর, অবিশ্যি যদি সেদিন সেই বিকেলের মধ্যেই চলে গিয়ে থাকে তো আলাদা কথা—এখন প্রত্যেকটি স্টেশন—শুধু এখানকারই নয়, ওদিকে আসানসোল এদিকে খড়্গপুর পর্যন্ত—এয়ারোড্রোম, সব ওআচ করা হচ্ছে, প্রত্যেক ট্রেনে লোক যাচ্ছে। আপনি তো আবার সি. বি. আই.কেও য়্যালার্ট করেছেন—'

বাধা দিয়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করল নলিনাক্ষ, 'কী রকম? সেটা কে বললে?'

'আমরা স্যার সব খবর পাই। আপনার বন্ধু দেবীবাবু কোথা থেকে একটা নোট পাঠিয়েছেন এখানের আপিসে, টপ প্রায়রিটি দিতে ব্যাপারটাকে। আরও বলেছেন, আপনার বাড়িতেও একটু নজর রাখতে—কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা অর্থাৎ আপনার ওপর কোন হামলা না হয়—'

নলিনাক্ষ তখন আগের রাত্রের ঘটনাটা বিবৃত ক'রে বলল, 'এটা আপনারা জানেন?'

ভদ্রলোক মুখে একটা 'ফিউ' ধরনের আওয়াজ ক'রে বললেন (বোধহয় বিলেত থেকে শিখে এসেছেন এ মুদ্রাদোষটা), 'আমার রিপোর্ট হচ্ছে, গাড়ি একখানা এসেছিল বটে, তা থেকে পুলিসের উর্দিপরা একজন লোকও নেমেছিল, তবে এক মিনিট কথা বলেই চলে গেছে। আমরা ভেবেছি সি. বি. আই. থেকে কেউ এসেছিল।...বাই জোভ! আপনি তো ভাবিয়ে দিলেন দেখছি! হাউএভার, এটা বলে ভাল করেছেন। আমি চেক করছি ব্যাপারটা।'

তিনি যথারীতি নমস্কারাদি ক'রে বিদায় নিলেন।

সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরবে বলে তৈরী হচ্ছে, লালবাজার থেকে আবার একটি ফোন।

'হ্যালো, নলিনাক্ষবাবু! আমি লালবাজার থেকে বলছি। মধুসূদন সমাদ্দার বলে কাউকে চিনতেন?'

'কেন বলুন তো? চিনতুম মানে—অল্প দু-চারদিনের আলাপ। আমরা পুরী গিছলুম, পিছনের বাড়িতেই উনি ছিলেন। সেই সূত্রেই আজ সকালেও একবার দেখা করতে এসেছিলেন। কোন বিশেষ পরিচয় ছিল না। কেন, কী ব্যাপার জানতে পারি না?'

'পারেন বৈকি। সল্ট্‌ লেকের যে জমিগুলো রিক্লেম্‌ড্‌ হয়েছে, তারই একটা মাঠের মধ্যে তাঁর ডেড বডি পাওয়া গেছে, একটু আগে। পকেটে একটা সাধারণ ধরনের নোট বই ছিল। তারই মধ্যে একটা কাগজের টুক্‌রোতে আপনার নাম-ঠিকানা লেখা—'

'হ্যাঁ, আমিই লিখে দিয়েছিলুম পুরী থেকে আসার আগে। উনিই চেয়েছিলেন। তা ডেড বডি—মানে য়্যাক্‌সিডেণ্ট?'

'না, সেখানে য়্যাক্‌সিডেণ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। এক যদি হবার পর কেউ এনে ফেলে দিয়ে না থাকে। মার্ডার বলেই সন্দেহ হচ্ছে।'

॥ ৮ ॥

অতঃপর আর মধুবাবুর আন্তরিকতা—'বোনাফাইডি'তে সন্দেহ করার কোন কারণ থাকে না। যে বাঘের গর্তের কথা অত ক'রে বলে সাবধান ক'রে দিয়ে গেলেন ভদ্রলোক ওকে—তাঁরই ভাষায়—টিপ্‌স্‌ দিতে এসে—সেই গর্তে নিজেই যে পা দিচ্ছেন তা জানতেন না।

ওকে বাঁচাতে গিয়েই নিজের জীবনটি দিলেন হয়ত।

আসলে উনি কিন্তু সেই মেয়েটার কথাই ভেবে এসেছিলেন। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোবে তা জেনেও।

সেই কারণেই, তাঁর ইঙ্গিত দেওয়া পাড়ায় যেতে একটা ভয়

রে। অমন ঘাগী লোকই ঘায়েল হয়ে গেল, তার মতো আনাড়ীকে তা ছারপোকা মারার মতো মেরে ফেলবে। সব চেয়ে বড় কথা—ক্র কে, কেন শত্রু, সেটা জানা থাকলেও সাবধান হওয়া যায়, সইটেই যে বুঝতে পারছে না।

এধারে একটির পর একটি দিন কেটে যাচ্ছে, না ফিরছে দোলা, া পাওয়া যাচ্ছে তার কোন খবর। রথীনবাবুর স্ত্রী নাকি পাগলের তো হয়ে গেছেন একেবারে।

অনেক ভেবে আবার একদিন চৌরঙ্গী তালতলার মোড়ে নেমে ড়ল বাস থেকে। আজকাল কোন কোন দিন ট্যাক্সি করে আসে, এলেও খানিকটা এসে নেমে পড়ে, আবার বাস ধরে। কোনদিন বা সবটাই বাসএ আসে। আজও তাই এসেছে।

বাস থেকে নেমে নিজের অজ্ঞাতেই একবার যেন উৎসুক ভাবে চায়, বুঝি সেই খোঁড়া ছেলেটাকে খোঁজে—বেঁচে নেই জেনেও। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রাস্তায় নেমে আসে, চারিদিকে চেয়ে দেখে। পুরনো, মানে আগে দেখা ভিখিরীদের মধ্যে সেই গন্নাখঁ্যাদা লোকটা আছে আজ। নাকের কাছে বিরাট একটা গর্ত, ওপরের ঠোঁটও কাটা, বড় বড় কটা দাঁত বেরিয়ে আছে সামনে—বীভৎস দৃশ্য। একটা হাতও কাটা লোকটার, কনুই থেকে। বাকী হাতটায় লোহার বালা এক গাছা, মাথাতে সামান্য একটু চুল চুড়ো-বাঁধা, গালে অল্প অল্প দাড়ি। দেখলে মনে হয় শিখ সাজারই চেষ্টা আছে একটা।

সেও অমনি আধা-চলতি বা দাঁড়ানো গাড়ির ফাঁকে ফাঁকে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছে।

নলিনাক্ষকে একটু নিরাপদ জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। তার ফল হ'ল এই যে লোকটা এদিকে আর চায়ই না, তার সব নজরটাই গাড়ি আর গাড়ির আরোহীদের দিকে। যাই হোক, নলিনাক্ষও পকেট থেকে একটা দশ নয়া বার ক'রে প্রস্তুত ছিল, একবার এদিকে চাইতেই সেটা দেখিয়ে ইশারা করল।

ছুটেই এল লোকটা। পয়সাটা হাত থেকে নিয়ে আবার ওদিকে ফিরছে, নলিনাক্ষ বলল, 'দাঁড়াও, আরও পয়সা দেব।'

একটু অবাক হয়েই এদিকে তাকাল লোকটা, এবার দৃষ্টিতে একটু সন্দেহের ছায়াও। অন্তত নলিনাক্ষর তাই মনে হ'ল। সে এবার একটা টাকা বার ক'রে দেখাল। বলল, 'এইটে দেব। তুমি আমার কটা কথার জবাব দেবে?'

সে একটু যেন বিরক্ত হয়েই বললে, 'আমাদের বাবু ছুটোছুটি ক'রে ভিক্ষে করতে হবে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে বেশীক্ষণ তো কথা কইতে পারব না। কী বলবেন, চটপট বলুন।'

'এইখানে একটা কালো মতো খোঁড়া ছেলে ভিক্ষে করত, কেলো নাম—সে কোথায় গেল বলতে পারো?'

লোকটার বীভৎস মুখ ভয়ঙ্করতর হয়ে উঠল। বলল, 'জানি না।' বলে চলেই যেত, কিন্তু একটা টাকার মায়াও কম নয়। তাই যেতে গিয়েও ইতস্তত: করতে লাগল।

সময় নেই বেশী তা নলিনাক্ষ বুঝল। সেও সোজা আসল প্রশ্নয় চলে এল, 'তোমার এমন হাল হ'ল কেন? কেউ করেছে, না য়্যাক্‌সিডেণ্ট!'

'ছোটবেলায় ঘা হয়েছিল। ডাক্তার কেটে দিয়েছে।'

'সে না হয় নাকে হ'তে পারে। হাতটা?'

'গাড়িতে কাটা গিছল।'

তার পরই হিসহিসিয়ে উঠল লোকটা, 'সরে পড়ো দিকি। এখান থেকে চলে যাও। আর এমন ধারা শয়তানী করতে এসো না। নিজেও মরবে—আমাদেরও মারবে।'

সে আর পুরো ঐ একটা টাকার মায়াও করল না, প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়েই ভিড়ে মিশে গেল।

অর্থাৎ সেই একটা আকারহীন পরিচয়হীন বিপদের ইঙ্গিত।

ভয় নয়—আজ যেন বিরক্তিই বোধ করতে লাগল নলিনাক্ষ।

এমন করে ছায়ার সঙ্গে লড়াই করার থেকে বিপদকে চ্যালেঞ্জ করাই ভাল। তা-ই করবে সে।

আপিসে আসতে দেরি হয়ে গিছল এমনিতেই, তবু তখনই নিজের ঘরে যেতে ইচ্ছে করল না। জানে কিছুই কাজ নেই। থাকলেও সে এক ঘণ্টার ব্যাপার। ঘুরতে ঘুরতে নিউজ-রুম বা নিউজ-হলেই গিয়ে পড়ল।

সেখানে যে মুখরোচক বা উত্তেজক কোন প্রসঙ্গর আলোচনা চলছে—তা বাইরে থেকেই টের পেয়েছিল, এখন ও ঢুকতেই সকলে মিলে সেদিনের মতো 'এই যে!' বলে একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

নলিনাক্ষ জোর ক'রেই হাল্‌কা হতে চেষ্টা করে। বলে, 'দেখি ধীরেনদা, একটা আপনার ঐ গাঁজা-মার্কা সিগারেট। কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

গৌরীবাবু বললেন, 'আরে বাবা, আমরা জানতুম স্মাগলারদের রাঘব বোয়ালরা সব শহর বোম্বাইমে রহতা হ্যায়। এখানে থাকলেও চুনো পুঁটি, বড় জোর খলসে। তুমি বাবা তোমার পাড়াতে এই চীজ জাইয়ে রেখেছিলে এত দিন ছিপায়কে ছিপায়কে—তাও রাঘব বোয়ালও নয়, একেবারে তিমি মাছ···হোয়েল।'

'কী রকম? সে আবার কি? তাও বলি তিমি মাছ জাইয়ে রাখা যায় না—কৈ-মাগুরই থাকে।'

'না বাবা। তিমি না হ'লেও হাঙ্গর কুমীর তো বটেই।'

'কিন্তু মানুষটা কে—তাই যে শুনলুম না ছাই।'

'বলি পরেশ—পরেশ চাকলাদার, তোমার পাড়ায় থাকে তো—না কি?'

'তা থাকে। কিন্তু সে আবার কি করল?' এবার আর তামাশার সুর বজায় রাখতে পারে না নলিনাক্ষ। হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে পড়ে টেলিপ্রিন্টারের কাগজটার ওপর।

দেখল কথাটা ঠিকই। পরেশ চাকলাদার ধরা পড়েছে। ওই

পরেশ চাকলাদারই যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঠিকানাও মিলে যাচ্ছে, তাছাড়া য়্যারেস্ট করা হয়েছে পুরী, চক্রতীর্থর কাছ থেকে সেখানেই তার শোবার ঘরে তিন লাখ টাকার মতো সোনা পাওয় গেছে, সোনার বিস্কুট, বিদেশী ছাপ মারা। তা ছাড়াও পাওয়া গেছে গাড়ির লাইনিংয়ের মধ্যে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য। চাকলাদারকে আপাতত ভুবনেশ্বরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখান থেকে সম্ভবত কলকাতায় আনা হবে।

লোকটাকে দেখতে পারত না, এ ঐশ্বর্য সোজা-রাস্তায় আসে না তাও জানে—তবু নলিনাক্ষ যেন একটা প্রচণ্ড হতাশা বোধ করে।

আসলে, যে সন্দেহটাকে এতদিন মনে মনে লালন করছিল, যেটাকে কেন্দ্র ক'রে ওর তাবৎ জল্পনা-কল্পনা, সেইটেরই মূলোচ্ছেদ হয়ে গেল। আবার নতুন ক'রে সমস্ত প্রশ্নটা ভাবতে হবে।

তুটি লোককে সন্দেহ করছিল—তুটিই গেল। এখন কে ?

শত্রু জানা থাকলে, দৃশ্য হলে তবু বোঝা যায়, অলক্ষ্যে থাকলেই ভয় বেশী।

দেবীপদটাও যদি এখানে থাকত। হয়ত সে-ই ধরাল পরেশবাবুকে। কিন্তু এখনও কি করছে সেখানে ? আরও কেউ বাকী আছে ? যাবে নাকি আর একবার পুরীতেই ? সেখানে অন্ধকারে বিপদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে যদি সে ছুটে আসে। এখানেই বা কে থাকে, সেও তো একটা সমস্যা। রঘুর ওপর ভরসা ক'রে যাওয়া চলে না। তাছাড়া দাদাকে জরুরী খবর দিয়ে না হয় আনানো চলত—দাদা এলে তাঁকে রেখে সেইদিনই রওনা দেওয়া চলত—কিন্তু এ তো শুক্লপক্ষ চলছে। অত আলোয় দেবীপদ বেরোবে না।

কী করবে কিছুই যেন ভেবে পায় না।

শূন্য ক্লান্ত মনেই বাড়ি ফিরল সে। সত্যিই কেমন একটা বিমূঢ় অবস্থা তার। কিছু ভাবতেও পারছে না গুছিয়ে। পরামর্শ করবে এমনও তো কেউ নেই। সকলকে সব কথা বলা যায় না।

শুধু এইটে বুঝতে পারছে—কোন জ্ঞাত তথ্য থেকে নয়, যাকে ষষ্ঠানুভূতি বলে তাইতেই—যে, সময় আর মোটে নেই। যেন চারিদিক থেকে একটা জাল গুটিয়ে আনছে কে।

অদৃশ্য অথচ অনুভূতিগোচর চক্রান্ত ও অনিষ্টের জাল। হয়ত বা মৃত্যুরই ফাঁদ সেটা।

রাত্রে দাদা ফোন করলেন, তাঁর ছেলে অর্থাৎ নলিনাক্ষর আপন ভাইপোকে সেইদিনই সন্ধ্যায় মন্দির থেকে কে একজন সরিয়ে নিয়েছিল।

ওঁরা বিমলার মন্দিরে ঢুকেছেন, সে যে যায় নি ভেতরে অত কেউ লক্ষ্য করে নি—বেরিয়ে এসে দেখল—নেই। চেঁচামেচি কান্নাকাটি পড়ে গিছল, একটা আধপাগলা ভিখিরি আনন্দবাজারে ঢোকার মুখে বসে ছিল, আপন মনে বিড়বিড় ক'রে বকছিল—সেই-ই হঠাৎ উঠে একটা অশ্রাব্য গালাগাল দিতে দিতে এসে ওর দাদার হাতটা ধরে ইঙ্গিত করে—অতিরিক্ত অসংখ্য যে সব ছোট ছোট মন্দির আছে বড় মন্দিরের প্রাঙ্গণে পাঁচিলের ধারে—তারই একটার দিকে।

ছোট, মনে হয় বহুদিনের পরিত্যক্ত মন্দির। পাণ্ডার ছড়িদার যেতে চাইছিল না, ওর দাদা ছুটে গিয়ে দেখলেন একটা রোগামতো লোক ছেলেটাকে নিয়ে ঐ মন্দির আর পাঁচিলের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে ঘাপ্‌টি মেরে রয়েছে। এর মধ্যেই ছেলেটাকে অজ্ঞান ক'রে দিয়েছে। অতঃপর মারধোর, পুলিসে দেওয়া, যা করবার সবই করা হয়েছে কিন্তু ওর বৌদি খুব ভয় পেয়ে গেছেন, তিনি আর একা থাকতে চাইছেন না দাদাকে ছেড়ে। তাঁর যে ভাইয়ের যাওয়ার কথা ছিল, তার আর যাওয়া অবশ্যই সম্ভব নয়। অথচ গুহবাবু না এলে সকলে বাড়ি ছেড়ে আসাও উচিত মনে হচ্ছে না, 'ইট ইজ হেল্‌ড্‌ ইন ট্রাস্ট' দাদা বললেন।

অগত্যা দাদা আপিসে টেলিগ্রাম করছেন, ডাঃ দত্তকে দিয়ে একটা সার্টিফিকেট দিয়েও পাঠাচ্ছেন, 'সিক রিপোর্ট' যাকে বলে—

অতিরিক্ত ছুটির জন্যে। নলিনাক্ষ ওঁদের জন্যে বেশী না ভাবে, যেন সাবধানে থাকে, যদি আপিস থেকে কোন দারোয়ানকে কিছু দিয়ে রাত্রে বাড়িতে রাখতে পারে তো আরও ভাল। ইত্যাদি—

বক্তব্য শেষ ক'রেও আর একটি কথা বলেন দাদা। সেই পাগলটাকে বকশিশ স্বরূপ দশটা টাকা দিতে গিয়েছিলেন, সে নেয় নি, গালাগাল দিয়েছে, ওঁর দিকে চেয়ে থুথু ফেলেছে—কিন্তু তার মধ্যেই এক ফাঁকে বলেছে, 'ছেলেমেয়েদের নিয়ে এমন ভাবে বেরোও কেন, লজ্জা করে না! ঘরে রেখো, রাত্রে বেরিও না আর।'

সময় ছ মিনিটও পার হয়েছে, আর কিছু না বলে দাদা রিসিভার রেখে দিয়েছেন। নলিনাক্ষর কোন প্রশ্ন করা কি আর কিছু জানার সময় হ'ল না আর।

তার দাদা যতই অবাক হোন, সে হয় নি। সে বুঝেছে। আশ্বস্তও হ'ল একটু।

এ দেবীপদরই কাজ। ওদের পাহারা দেবার ব্যবস্থা করেছে।

দেবীপদর কাছে জীবনের ঋণ বেড়েই যাচ্ছে দিনের পর দিন।

॥ ৯ ॥

পরের দিন সত্যি সত্যিই আপিস থেকে বেরিয়ে ইলিয়ট রোডের ট্রাম ধরল সে। মধুবাবু গেছেন কিন্তু তাঁর উপদেশটা আছে; মধুবাবু মরে প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে তিনি ওর দলের লোক। অর্থাৎ ওর কল্যাণাকাঙ্ক্ষীই ছিলেন। তাই, কোনদিকেই যখন কিছু করা যাচ্ছে না—তাঁর কথাটা শুনতে দোষ কি? অবশ্য হুঁশিয়ার ক'রেও দিয়ে গেছেন যথেষ্ট, বাঘের গর্ত বলে গেছেন—সে যতটা সম্ভব সাবধানেই এগোবে—তবে এ রকম অনিশ্চিত অনির্দেশ্য বিপদের ভয়ে দিন কাটানোর চেয়ে বিপদের দিকে এগিয়ে যাওয়া অনেক ভাল।

ট্রাম থেকে নেমে আস্তে আস্তে হাঁটছে—ঠিক কোন্ দিক দিয়ে কি ভাবে যাবে; কী খুঁজতে এসেছে, কাকে কি জিজ্ঞাসা করবে তাও

তো জানে না—বেনেপুকুরের মোড়ের মাথায় হঠাৎ বরকত আলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

নলিনাক্ষর মনে হ'ল, এ ঈশ্বরেরই যোগাযোগ, মনে হ'ল ঠিক এই রকম একটি লোককেই খুঁজছিল সে।

বরকত আলী লোকটিকে দেখলে আগেই যে জীবটির কথা মনে আসে, সে হ'ল শকুনি। রোগা, লম্বা, কালো, শকুনির ঠোঁটের মতোই ধারালো বাঁকা নাক, দুটি ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ। মুখের ভাব নির্বিকার, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে ঠোঁটের যে ভঙ্গী প্রকাশ পায় তাতেই বোঝা যায় যে লোকটি নির্মম ভাবেই নির্বিকার। মায়া-মমতা-দয়া প্রভৃতি দুর্বলতা বা চিত্তদোষ কখনই ওর স্বার্থসিদ্ধিপথে অন্তরায় হ'তে পারবে না কোন দিন।

বরকত আলীর প্রাথমিক পরিচয় অবশ্য রাজমিস্ত্রী হিসেবেই। মেদিনীপুর জেলায় বাড়ি, ভাল রাজমিস্ত্রী। বুদ্ধিমান বলেই সেই সংকীর্ণ কর্ম-গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে নি। বুদ্ধিমান—এবং অত্যন্ত ফিকিরবাজ, যোগাড়েও খুব। এখন ঠিকেদারী করে, অনেক বড় বড় কনট্র্যাক্টারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের কাছ থেকে ভাল কাজ কেড়ে নেয়। তার কারণ যারা ওকে একবার কাজ দেয় তারা আর অন্য লোককে দিতে চায় না। কোন জিনিসের জন্যে তাদের আর ভাবতে হয় না, কোন কারণে, কোন অবস্থাতেই বাড়ির মালিককে বিরক্ত করে না। আপনি রাতারাতি একটা গোটা ঘর বদলে অন্য রকম অন্য ছাঁদে করবেন? তাই হবে, বরকত আলী তো আছেই। শুধু টাকাটা ঠিক মতো দিয়ে গেলেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

এইটেই হচ্ছে বরকত আলীর চরিত্রের প্রধান দোষ বা গুণ। টাকার জন্যে না পারে এমন কাজ নেই, টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। কেউ যথেষ্ট টাকা দিলে নিজের হাতে পায়খানা সাফ করবে ও, অম্লান বদনে। টাকা না দিয়ে একটু সামান্য কাজও করানো যাবে না। তবে একবার হাত পেতে টাকা নিলে সে কাজ—ততটুকু টাকার মতো কাজ—ক'রে দেবেই সে।

নলিনাক্ষ ওকে দিয়ে বহুবার টুকরোটাকরা বহু কাজ করিয়েছে। আত্মীয়স্বজনদেরও অনেককে ওর কথা বলে দিয়েছে। ফলে ওর সঙ্গে এতদিনে একটু বন্ধুত্বের মতোও হয়ে গিয়েছে। ঠাট্টা তামাশা রসিকতাও চলে দেখা হ'লে। যেখানে টাকার প্রশ্ন নেই, সেখানে বরকত আলী সহৃদয় সহজ মানুষ, রস-রসিকতা সেও করে এবং বোঝেও।

প্রাথমিক বিস্ময় প্রকাশ ও কুশল প্রশ্নের পর নলিনাক্ষ হাত ধরে টানতে টানতে একপাশে নিয়ে গিয়ে একেবারে একশো টাকার এক-খানা নোট পকেটে গুঁজে দিল। কী দিল তা খুলে দেখার প্রয়োজন নেই বরকত আলীর, ও যেন গন্ধতে বুঝে নেয় কে কত টাকা দিচ্ছে। নলিনাক্ষ কত দিল সে কথা না বলে 'আরও দেবো আমার কাজ উদ্ধার হলে' বলল শুধু।

বরকত আলীর প্রশান্ত মুখে একটি রেখাও ফুটল না। যেন সে নলিনাক্ষকে এবং এই প্রস্তাব আশাই করছিল, এমনি ভাব তার। শুধু প্রশ্ন করল, 'কাজটা কি ?'

বলল নলিনাক্ষ। ভরসা ক'রে বলেই ফেলল। কাউকে না কাউকে তো বলতেই হবে, যদি খোঁজ করতে হয়। বরকত তো তবু পরিচিত লোক। টাকা নিয়ে কারও সঙ্গে বেইমানী করেছে এমন শোনে নি আজও। আর যাকে বলবে সে কেমন হবে তা কে জানে।

সব শুনে বরকত কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অন্য দিকে চেয়ে। তারপর বলল, 'কাজ ক'রে দিলে আরও দেবেন বলছেন ; এ যা কাজ—যদি বা আমি ক'রেও দিই, করার 'পর আমি নেবার জন্যে বা আপনি দেবার জন্যে জিন্দা থাকবেন কিনা জানি না। নগদটাই বুঝি আমি। এ যা বলছেন একটা আড্ডা নয়, একটা দলও নয়। এমন অনেক। দুনিয়াময় ছড়িয়ে আছে। অবশ্যি এদের একটা আড্ডা আমি জানি, দেখিয়েও দোব কিন্তু টাকা আগাম চাই।'

বরকত আলীর চক্ষুলজ্জা আছে—বা প্রয়োজনের সময় অপরের

মনে তার কোন্ কথার কি প্রতিক্রিয়া হবে—তা বিবেচনা ক'রে মোলায়েম 'চিনি মণ্ডিত' ক'রে কথা বলবে—এমন অপবাদ তাকে শত্রুতেও দিতে পারবে না।

নলিনাক্ষও তা জানে, ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে, 'কত টাকা ?'

'এক হাজার টাকা। এক হাজার টাকার আমার খুব দরকার। কালকের মধ্যে চাই। আমি আমার জামাইকে পাঠাব ধার চাইছি বলে, আপনিও সেই ভাবেই তার সঙ্গে কথা কইবেন, ভেতরের কথা বলার দরকার নেই। তারপর কাল এমনি সময় এখানে আসবেন, আমি ঐ গলিটার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকব। আপনার দিকে চাইব না, আপনিও আমার সঙ্গে কথা বলবার বা কিছু ইশারা করার চেষ্টা করবেন না—তাহলে আপনিও মরবেন, আমিও মরব। আপনি এলেই আমি ঠিক দেখে নেব, ভাববেন না। আমার কাঁধে একটা ছাতি থাকবে, আমি গলিতে ঢুকব, আপনি একটু দূর থেকেই আমার পিছু নেবেন। যে বাড়ির সামনে গিয়ে ছাতিটা নামিয়ে আবার তুলব কাঁধে—ছাতির ডগাটা হেলিয়ে দেখিয়েও দোব—সেই বাড়ি জানবেন।'

তার পর একটু থেমে, মুখের আনত অবস্থাতেই আশ্চর্য কৌশলে কপিশ শ্যেন দৃষ্টিতে চারিদিক দেখে নিয়ে গলাটা আর একটু নামিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনিও থামবেন না, আমিও থামব না। ওদিকে খানিকটা গিয়ে আমি ডাইনে চলে যাবো, আপনি আর কিছুটা গেলে বড় রাস্তায় পড়বেন। তখনই সে বাড়িতে যাবার কি খোঁজখবর করার চেষ্টা করবেন না, ফিরেও আসবেন না। বাড়ি ভুল হবার কোন কারণ নেই। পরের দিন কেন, অমন পাঁচ-সাত দিন পরে এলেও চিনতে পারবেন।...'

আরও একটু থেমে হুঁশিয়ারির সুরে বলল, 'তবে আগেই বলে দিচ্ছি, আমার কোন দায়দায়িত্ব নেই। আমি নিজের চোখে কিছু দেখি নি, এ ধরনের কারবারের কথা শুনেছি, আর কিছু জানি না। আমার মামা সওকৎ ঐ বাড়িতে একবার কাজে

গিছল, সামনে একটা বাড়ি, এটা দোতলা, পিছনে তেতলা বাড়ি আছে একটা, এ-বাড়ি দিয়েই সে-বাড়ি যেতে হয়—। সামনের বাড়িতেই কাজ ছিল, ওর তো সবতাতে নাকগলানো অব্যেস—একবার এক ফাঁকে ভেতর-বাড়িটায় ঢুকে গিছল—একটা ফুটো দিয়ে দেখেছে, একটা ঘরে অনেকগুলো বাচ্ছা, সার সার ঘুমোচ্ছে। ও অত বুঝত না। কিন্তু যে ডেকেছিল ওকে, তার কী রকম সন্দেহ হয় একটা, অনেক জেরা করে যে ভেতরের ঐ বাড়িটার দিকে কখনও কোন সময় গিছল কিনা। সওকৎ বলে, বাপরে, সে যা জেরা, উকিলের বেহদ্দ। তাতেই আমার কেমন মনে হয়েছিল—এখন আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ওগুলো সেই সব চোরাই বাচ্ছা। ঘুম নয়—আফিং ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান ক'রে রেখেছে।'

তারপর একটু থেমে হঠাৎ যেন বাড়ি মেরামতের হিসেব দিতে লাগল, 'ইট ধরুন তিন হাজার, মাটি এক টন—এ তো লাগবেই। তা ছাড়া ধরুন, বালি আছে লোহা আছে, দরজা জানলা—পুরনো কিনলেও এক একটা একশ' টাকার কম নয়। আপনি যতই যা বলুন, চার হাজারের কমে ও ঘর নামবে না।'

নলিনাক্ষ অবাক হলেও এক্ষেত্রে যে বিনা মতলবে বরকত কিছু বলছে না—সেটুকু বোঝার মতো উপস্থিত-বুদ্ধি তার নষ্ট হয় নি। অনেক কষ্টে, মনোযোগ দিয়ে হিসাবটা বোঝার চেষ্টা করছে, সেই ভাবটা বজায় রেখে আড়ে চেয়ে দেখল একটা মোটা মতো লোক হেলতে দুলতে একেবারে ওদের পাশ দিয়েই চলে গেল। অকারণেই—ওদিকে ঢের জায়গা পড়ে থাকা সত্ত্বেও।

সে লোকটা চলে গেলে আবার তেমনি প্রশান্ত মুখেই—পিছন ফিরে কি এপাশ-ওপাশ না তাকিয়েই আগের কথার খেই ধরল বরকত, 'বাড়িটাতে বেশী লোক থাকে বলে কেউ জানে না, একটি লোক—নিয়মিত যেন কাজে বেরোয়, কাজ থেকে ফেরে, হিন্দুস্থানী লোক, মধ্যে মধ্যে—মধ্যে মধ্যে কেন বেশির ভাগই—পুলিসের পোশাক পরে বেরোয়। তাতেই সকলে ধরে নিয়েছে পুলিসে কাজ করে। মধ্যে মধ্যে

সিপাইয়ের পোশাক পরা লোকও আসে, হেঁটে, সাইকেল ক'রে—আপিসের চিঠি নিয়ে যেমন আসে সাধারণত তেমনিই—। কিন্তু আমার ভাগ্নে বাহার বলেছে আমাকে, একবার তার সামনে একদিন পড়ে গিছল, তুজন এসেছিল, তার মধ্যে একজনকে বাহার চেনে—তার চোদ্দ-পুরুষে কেউ পুলিস নয়, চোরাই ভাঙ-গাঁজা-কোকেনের কারবার করে। আরও আছে, অনেক ব্যাপার। বাহার সামনের বাড়িতে যায়, ওর সব অনেক রকম কাজকাম আছে—সে থাক, ও লক্ষ্য করেছে অনেক জিনিস। বাজারহাট আসে, লোকে মাথায় ক'রে নিয়ে আসে। অনেক মাল আসে এক-একদিন কিন্তু তবু গাড়ি আসে না। বাড়ির মেয়েদের কেউ দেখে নি, তবে এক-আধ দিন গভীর রাত্রে মাথায় কাপড় দিয়ে বেরোতে কি ঢুকতে দেখেছে মেয়েছেলে। একদিন শেষরাতে নাকি অনেক কে সব এসেছিল, ঐ মোড়ের মাথায় গাড়ি রেখে—আবার পরের দিন শেষরাত্রে বেরিয়েছিল। বাহারকে কাজে পড়ে তু-তিন দিন ঐ সামনের বাড়িতে থাকতে হয়েছিল—তাতেই দেখেছে।...যাই হোক, যা বললুম, ঠিকমতো তাই করবেন, যদি উল্‌টোপাল্‌টা কিছু করেন—আমিও উল্‌টো গাইব. আমার কাছে সাফ কথা।'

॥ ১০ ॥

নলিনাক্ষ মন স্থির ক রেই ফেলল।

এটুকু সে বরকতকে এতদিনে চিনেছে, সে যা বলেছে. তার নড়চড় হবে না, টাকাও এক পয়সা কমাবে না। ওরও যখন এটা জানা দরকার—টাকার মায়া করলে চলবে না।

সে একটি নশ' টাকার সেল্‌ফ্ চেক লিখে পিছনে সই ক'রে বরকতের জামাই পেয়ার আলীকে দিয়েছিল।

পেয়ার আলী এসেছে সকাল আটটায়—তখন অত নগদ টাকা কোথায় পাবে? সইসাবুদের কোন দরকার নেই, পেয়ার আলীকে

ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিল সেটা, কোন ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে পড়তে হবে না। তবু সন্দেহ ছিল বরকত যে ধাঁচের লোক, হয়ত এ চেক সে নেবে না, কাজও করবে না।

কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে ট্রাম থেকে নামতেই তার চেককাটা লুঙ্গি, আদ্দির শার্ট আর কাঁধে ছাতাটা দেখা গেল। এদিকে ফিরে নেই, ওর সামনে কোন পানের দোকানও নেই যে আয়নায় দেখবে—তবু নলিনাক্ষ নামামাত্র সে চলতে শুরু করল। ধীরেসুস্থে, মন্থর গতিতে। পিছন থেকে যা মনে হল ইতিমধ্যে একটি জর্দা দেওয়া পান সংগ্রহ করেছে—বেশ মৌতাতের আমেজে চিবোতে চিবোতে যাচ্ছে সেটা।

যথাস্থানে গিয়ে ছাতা একদিকে হেলে কাঁধ-বদল হল। নলিনাক্ষ বাড়িটা আড়ে দেখে নিল। দোতলা পুরনো বাড়ি। যেমন এ-পাড়ার বাড়ি হয়। জানলায় পর্দা ঝুলছে, বাইরে নিচে এক দিকে এক লন্ড্রি, এক পাশে কোন একটা কি গুদোম মতো, চাবি দেওয়া রয়েছে। আর একটু চওড়া গলি হলে সেটাকে গ্যারেজ ভাবা চলত। কিন্তু এখানে সাধারণ মাপের গাড়ি ঘুরিয়ে ওখানে ঢোকানো শক্ত।

পিছনের তিনতলা বাড়িটা এখান থেকে দেখা যায় না। তার একটা সরকারী পথ নিশ্চয়ই আছে আগমন-নির্গমনের—হয়ত সেদিকটা বন্ধ থাকে কিংবা এমন কোন ভাড়াটে বসানো আছে, যাদের সে ভাড়া নেওয়াটা নিতান্তই আবরণ মাত্র।

তখন আর দাঁড়ানো উচিত নয়। দাঁড়ালও না। ঠিকই বলেছিল বরকত, ভুল হবার কোন কারণ নেই। উলটো দিকের বাড়িটাও দেখে নিয়েছে, সদর দরজায় কে চকখড়ি দিয়ে 'চারশ বিশ' লিখে রেখেছে। তার বাইরের একটা ঘরে সামান্য মুদির দোকান একটা, তার সঙ্গে চিঁড়ে মুড়ি ডিমও পাওয়া যায়।

কোনমতে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ আবার বেরিয়ে পড়ল। সারা রাত ঘুমই হয় নি ভাল ক'রে—উত্তেজনায় ও আশঙ্কায়, শুধু এপাশ-ওপাশ করেছে। এ ধরনের কাজ, গোয়েন্দাগিরি

কখনও করে নি, কীভাবে করবে তাও জানে না। বরুণের বেলায় যেটুকু করেছিল—না জেনে। এ যে কোন্ বিপদের মধ্যে পড়ছে কে জানে! বার বারই মনে হচ্ছে—পুলিসের কাছে সব কথা জানিয়ে সঙ্গে নিয়ে এসে বাড়িটা দেখিয়ে দেয়। কিন্তু তখনই আবার মনে পড়ছে মধু-বাবুর কথাটা। 'পুলিসের কম্ম নয়'। মধুবাবু তাকে টিপ্‌স্ দিতে এসে প্রাণটা দিলেন। তাঁর কথার মূল্য অনেক।

ওখানে যখন পৌঁছল তখন সাড়ে দশটা। গলিটা যেন কালকের সে গলি নয়, রীতিমতো কর্মব্যস্ত, জনমুখর রাস্তা। বহু লোক নানা কাজে যাতায়াত করছে, ফিরিওলা হাঁকছে। এর মধ্যে কে কোন্ বাড়িটা লক্ষ্য করছে কিংবা কার দিকে চেয়ে আছে—তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

বেড়াতে বেড়াতেই যাচ্ছিল, কাছাকাছি একটা পানের দোকান দেখে সিগারেট কেনার জন্যে দাঁড়াল। দু-একটা দামী সিগারেট চাইল ইচ্ছে ক'রেই—যা এ-পাড়ায় পাবার কথা নয়। পানওলা লোকটির মনে সম্ভ্রম জাগাবারই চেষ্টা এটা। কাজও হ'ল, লোকটি বেশ খাতির ক'রে—সাজা পান থাকা সত্ত্বেও আলাদা ক'রে একখিলি পান সেজে দিলে, প্যাকেট খুলে টাটকা সিগারেট বার ক'রে দিলে। তার পর প্রশ্ন করল, 'বাবু কি এ-পাড়ায় থাকেন? আপনাকে তো কৈ দেখেছি বলে মনে পড়ছে না— ?'

নলিনাক্ষ ধীরেসুস্থে পানটা একটু চিবিয়ে কায়দা ক'রে নিয়ে ওরই দড়ির আগুনে সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে বলল, 'না, আমার এক বন্ধু—অনেক দিন দেখি নি, সিঙ্গাপুরে চাকরি করে—ছুটিতে এসে এইখানে কোথায় উঠেছে। আমার জন্যে একটা ভাল বেতের ব্যাগ আনার কথা। চিঠি দিয়েছিল—সেটা হারিয়ে ফেলেছি। ঠিকানাও তাতেই ছিল। তার নাম তপন ভৌমিক, কে এক ডিসুজার বাড়িতে উঠেছে এসে, ঐখানেরই পরিচয়—এইটুকু মনে আছে।'

'ডিসুজা?' ভুরু কুঁচকে নামটা মনে করার চেষ্টা করল পানওলা। তারপর বলল, 'রাস্তার নাম মনে আছে?'

'তাহলে তো গোল চুকেই যেত। কিচ্ছু মনে নেই। এই পাড়া, এমনি একটা ধারণা আছে শুধু—'

'তাহলে তো বাবু বলা শক্ত। অনেক গলি, অনেক লোক। ডিসুজা অবিশ্যি ছিল একজন, এই গলিতেই, তা সে তো বহুত রোজ কাবার হয়ে গিয়েছে—ফৌৎ, মানে মারা গিয়েছে। সে পনেরো-ষোল বছরের ওপর হবে তো কম নয়। আর তো কৈ, ফিরিঙ্গি যা দু-এক ঘর এ গলিতে আছে—ডিসুজা কেউ না। ফার্নাণ্ডিজ আছে, টমাস, ডিমেলো—না ডিসুজা কেউ নেই।'

'যে ডিসুজা ছিল বলছ—সে কোন্ বাড়িতে থাকত?'

'ঐ যে—' আঙুল দিয়ে সেই বাড়িটাই দেখিয়ে দেয়—যেটা কাল বরকত আলী ইশারা ক'রে গেছে।

'তা ওখানে তার কেউ—মানে ছেলেমেয়ে ফ্যামিলি নেই?'

'না বাবু। কিরায়ার বাড়ি তো। তার পর বহুত হাত বদল হয়েছে। ডিসুজার বিবি বুড়ো বয়সে আমাদেরই এক মোসলমানকে শাদী ক'রে আলিগড় চলে গিয়েছে। সে ছোকরা টাকার লোভেই বুড়ীটাকে নিকে করেছিল—শুনেছি টাকা-পয়সা কেড়েকুড়ে নিয়ে বুড়ীকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সে এখন আগ্রায় না টুণ্ডলায় ভিক্ষে ক'রে খায়। মেয়েটার আগেই শাদী হয়ে গিয়েছিল—দুটো ছেলে, তারা সব কে কোথায় চাকরি-বাকরি করে—জানি না।'

'তা ও-বাড়িতে কে আছে এখন?' খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন, তবু মনে হয় পানওলার চোখে একটু সন্দেহের ছায়া পড়ে। তাড়াতাড়ি বলে, 'মানে, ঐখানেই এসে উঠেছে কিনা—'

'না না, ও-বাড়ি তারপর বহুত হাত বদল হয়েছে। এক উড়িয়া কিনেছে। সে সব ভাড়াটেদের উঠিয়ে দিচ্ছে টাকা দিয়ে দিয়ে। শুনছি হোটেল করবে। বুঝেছেন তো, হোটেলে আজকাল বহুত মুনাফা। এই সব গলি-ঘুঁজিতে হোটেল তো নামেই—আসলে দেদার রেণ্ডীর কারবার চালাবে।'

'অ।' আর দাঁড়িয়ে থাকার কোন কারণ নেই। একটা ভুলই

ক'রে বসল। আনাড়ীর কাণ্ড। মনে মনে নলিনাক্ষ জিভই কাটল একবার। এত কথা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বলা ঠিক হয় নি। এর পর এখানে বেশী ঘোরাঘুরি করলে কি খোঁজখবর করলে এই লোকটারই সন্দেহ হবে।

এর মধ্যে আর একটি খদ্দেরও এসে দাঁড়িয়েছে, পান ও বিড়ির। এ-পাড়ারই লোক মনে হয়, লুঙ্গির ওপর নাইলনের গেঞ্জি পরা। রোগা কালোমতো—মুখে 'মার অনুগ্রহের' দাগ। সেও আড়ে চাইছে ওর দিকে।

এক রকম মরীয়া হয়েই বলে উঠল নলিনাক্ষ, 'এ-পাড়ায় বাড়িটাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়?…কী রকম ভাড়া?…আমাদের ওদিকে যে ভাড়া হয়েছে—আমাদের ক্ষমতায় আর কুলোয় না।'

সেই রোগা লোকটিই আগু বেড়ে কথা বলল। পান খাচ্ছিল, খানিকটা পিচ ফেলে এসে বলল, 'বাড়ি আপনার দরকার? কেতো ভাড়া দিবেন? কখানা ঘর চাই আপনার? আমার নাম সোলেমান, আমি বাড়ি ভাড়ারই দালালি করি। হেঁ—হেঁ—'

'কী রকম ভাড়া এ-পাড়ায় তাই জিজ্ঞেস করছি। আমি এখন যে বাড়িতে আছি বাগবাজারে, অনেক দিন আছি—ভাড়া কমই দিই অবিশ্যি, নতুন নিলে ওর চেয়ে বেশী দিতেই হবে, আশি টাকায় পুরো দোতলা নিয়ে থাকি—তিনখানা ঘর, রান্নাঘর। তার কমে আমার কুলোবে না।'

'এতো সোস্তায় বাড়ি কোথা পাবেন। সে বাড়ি ছাড়ছেন কেন?'

'বড্ড পুরনো হয়ে গেছে, বাড়িওলা সারিয়ে দেয় না। তারা চাইছে আমরা উঠে যাই। তখন ঐ ফ্ল্যাট সারিয়ে ভাড়া দিলে কমসে কম দুশো টাকা পাবে।'

'সো তো ঠিক বাত আছে বাবু। জাস্তিই পাবে। তা আপনি কেতো কিরায়া দিতে চান?'

অভিনয়টা নিখুঁত করারই চেষ্টা করে নলিনাক্ষ, 'আমি তো চাইব যত কম দিয়ে হয়। সে কথা নয়—সওয়া শো'র বেশী দিলে আমার

কষ্ট হবে। বোনের বিয়ে বাকী, একা রোজগার করি—বুঝলে না?'

'হাঁ, সো বাত বোলেন। সোওয়া শোতে মিলবে এ-পাড়ায়। লেকিন আর কোথাও মিলবে না। বালিগোঞ্জ, ভোয়ানীপুর চোলেন—তিন কামরা ফিলাট্ সাড়ে তিন শো মাংগবে—কোম সে কোম।'

'কিন্তু—কিছু মনে ক'রো না—এ-পাড়াতে কি আমরা থাকতে পারব? সেই থেকে যা দেখছি, তোমাদের সব বিহারী মুসলমান, ফিরিঙ্গি, চীনে এই সবই তো দেখছি। আমরা হিন্দু—মেয়েছেলে নিয়ে বাস করতে পারব কি?'

'খুব খুব। বহুত শৌখ্‌সে। এ-পাড়ায় কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা কি চোরির কথা শুনেছেন? আখ্‌বারে পডিয়েছেন? এখানে কেউ কারও কথা নিয়ে থাকে না বাবু, যে যার আপনার আপনার কাম করে—খায় দায়, থাকে—।'

'তা—বাড়ি, মানে তোমার সন্ধানে আছে? এখন দেখাতে পারবে?'

'এখোন তো পারব না বাবু, একঠো জরুরী কাম আছে, এখনই মাটিয়াবুরুজ যাতে হোবে! আপনি যদি মেহেরবানী ক'রে সন্ধ্যায় আসেন—বড্ড ভাল হয়।'

'বেশ, তাই আসব। কোথায় আসব বলো।'

'এই মোড়ে আমি থাকব বাবু। কিংবা এই দুকানে। রাত সাড়ে সাতটার মধ্যে পঁহুছিয়ে যাবো, জরুর। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা, তাই হবে।'

ঝোঁকের মাথায় কাজটা ক'রে ফেলে একটু ভয়-ভয়ই করতে লাগল।

কি রকম লোক, কি মতলব কে জানে!

একবার ভাবল, গিয়ে কাজ নেই। আবার মনে হল, এখানে এ-পাড়ায় যদি খোঁজখবর করতে হয়, এ ঝুঁকি তো নিতেই হবে। নইলেই তো বরং—শুধু শুধু ঘুরলে—সন্দেহ করবে লোকে। যদি

সত্যিই শত্রুর দৃষ্টি তার দিকে থাকে—সে তো বুঝেই নেবে। এ তবু বাড়ি ভাড়ার নাম ক'রে—এ-বাড়ি পছন্দ হ'ল না, ও-বাড়ি—অনেকবার যেতে পারবে এই ছুতোয়। চাই কি এই উপলক্ষে আরও দু-চার জনের সঙ্গে আলাপ হলে ঐ বিশেষ বাড়ির খবরও বার করতে সুবিধে হবে। সোলেমানকে সুযোগ বুঝে কিছু কবলালে, সেও খবর দিতে পারবে।

বিকেলে আপিস থেকে বেরোবার সময় মনে হ'ল এখানে কাউকে কিছু বলে যাবে কিনা, অথবা বলে পরামর্শ চাইবে কিনা। কিন্তু তেমন কারও কথাই মনে পড়ল না। এখানে বন্ধু বলতে কেউ হয় নি এখনও। ছোকরা যারা—মদ হৈ হল্লা—এই নিয়েই আছে, 'বৃদ্ধ স্তাবৎ চিন্তামগ্ন' শঙ্করের ভাষায়, যে যার উন্নতি, কিসে কি সুবিধা আদায় করা যায়—রিটায়ার করার আগে কতটুকু রস নিংড়ে বার ক'রে নিতে পারে কুনাল দত্তর, এই চিন্তাতেই মগ্ন। ছেলে ভাইপো ভাগ্নের চাকরির জন্যে ব্যস্ত।

সুতরাং কাউকেই কিছু বলা হ'ল না।

যাবার সময় আপিস-ক্যান্টিন থেকে একটু চা ও খাবার আনিয়ে খেয়ে নিল শুধু। যদি ফিরতে দেরি হয়, ও-পাড়ায় চা খাওয়ার কোন জায়গা নেই।

বেরিয়ে ট্রামে উঠতে উঠতে একটা কথা মনে পড়ল—'ঢাল নেই তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার।' ওরও অবস্থা তাই। যাচ্ছে গোয়েন্দাগিরি করতে—একটা কোন রকম হাতিয়ার নেই সঙ্গে। অথচ দেবীপদ বন্ধু ছিল, ধরে পড়লে একটা রিভলভারের লাইসেন্স পাওয়া কঠিন হ'ত না। এমনিও যে চেষ্টাচরিত্র করলে পাওয়া যেত না তা নয়—চোরাই মাল লুকিয়ে-চুরিয়ে বিস্তর বিক্রী হয়।...কিছুই করা হ'ল না, কথাটা মনেই পড়ে নি, অথচ যাচ্ছে, মধুবাবুর ভাষায়, বাঘের গর্তে পা দিতে! বাঘের চোয়ালের মধ্যে, কে যেন বলেছিল না —দেবীপদই তো। এককড়ি। সে যদি থাকত, তাকে জানালেই আর এত কাণ্ড করতে হ'ত না ওকে। কী যে হ'ল ছোকরার।...

মোড়ের মাথায় পৌঁছতেই দেখল সোলেমান, প্রসন্ন মধুর অমায়িক

হাসিতে মুখটি রঞ্জিত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তফাতের মধ্যে এ-বেলা গায়ে একটা জামা উঠেছে, হাফ শার্ট একটা।

'আসুন বাবু। সালাম। ওঃ, কী যে করেছি আপনার জন্যি! মাটিয়াবুরুজ গিয়ে তো আটকে গিছলাম, আমার এক বুনের বর বহুত বদমাশ আছে, তারই তালাকের জন্যে ঘুরছি—সব ঠিক, আজ গিয়ে দেখি নানান্‌ ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে রাখছে। সেই মামলার কেজিয়া করতে করতে দেখি পাঁচটা বাজে। কী করব, বলি ভোদ্দোর-লোককে কোথা দেওয়া আছে—ইনগেজমেণ্ট—খেলাপী হলে তো আমাকে জানোয়ার ভাববেন। তাতেই, যা কখনও করি নি, টাক্সি মটর নিয়ে চলে এলাম। বাড়ি তো খোঁজে ছিল না, তু ঘণ্টায় কত খুঁজব বোলেন। যাই হোক তুটো ফিলাট্‌ দেখেছি, চলুন দেখিয়ে দিই—বাড়ি, বিশোয়াস রাখবেন, কালকের মধ্যে আউরো চার-পাঁচটা পাইয়ে যাবো। আজ তো ই-তুটো দেখাই। একটার ভাড়া এক শো তিশ, একটার কিছু কম হোবে। লেকিন—' গলা নামিয়ে বলে —'উপরে কেরেস্তান থাকবে বাবু। দেখেন—আউরো দেখাবো। ইটা তো দেখেন—'

খুশী হল নলিনাক্ষ। সে তো এখানে বার বার আসারই সুযোগ খুঁজছে। সে বললে, 'বলো তো কালই না হয় আসব—আজই যে ঠিক করতে হবে কোথাও একটা, এমন তো তাড়া নেই—। জলে তো পড়ি নি একেবারে।'

গলিতে ঢুকতেই সেই পানওলা লম্বা একটা সেলাম ঠুকল, 'আসুন বাবু, একখিলি পান? সেজে রেখেছি আপনার জন্যে। আর সেই সিগারেটও, সকালে যা চাইছিলেন—'

লোকটাকে হতাশ করতে মন চাইল না। এ হাতে থাকলে বিস্তর খবর পাবে। এসব জায়গায় এই পানওলারা অনেক খবর রাখে পাড়ার। সেও এগিয়ে গিয়ে বলল, 'দাও। সোলেমানের দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো? বেচারার তো বোধ হয় খাওয়াও হয় নি—'

'কুছু না, কুছু না। একঠো পান খাইবেন, কেতো দেরি হোবে? আমিও একঠো বিড়ি ধরিয়ে লিই।'

পান মুখে দিয়ে সোলেমানের সঙ্গে সেই গলি দিয়েই এগোল। বরকতের দেখিয়ে দেওয়া সে বাড়িটা ছাড়িয়ে গিয়ে একটা চার ফুট কানাগলি পড়ে। তার ভেতর নাকি বাড়ি—কিন্তু সেইখানটায় গিয়েই নলিনাক্ষর মাথাটা প্রচণ্ডভাবে ঘুরে গেল। মনে হ'ল বিরাট ভূমিকম্প হচ্ছে, গলির নিচটা তার দিকে অর্থাৎ উপর দিকে উঠতে চাইছে। তার পরই সব অন্ধকার হয়ে গেল চোখের সামনে। সোলেমান তার অবস্থা বুঝে ধরেনা ফেললে মাটিতে পড়ে যেত বোধ হয়।

মনে হ'ল যেন আরও কে ঐ কানাগলিটা থেকে বেরিয়ে এসে ওর আর একটা হাত ধরল। টানছে যেন ঐ দিকেই। সোলেমানও। তার পর আর কিছু মনে নেই। আর কিছু জানে না। সব অন্ধকার। গভীর সুষুপ্তি।

॥ ১১ ॥

মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা, বমি-বমি জ্ঞান হবার—তার পর প্রথম যে অনুভূতি হ'ল নলিনাক্ষর, তা এই।

কিছুই বুঝতে পারে না, কেন এমন যন্ত্রণা সেইটেই ভাবতে চেষ্টা করে শুধু। চোখ খুলতে কষ্ট হয়—কিছুতেই যেন চাইতে পারে না, গভীর ঘুমে যেমন চোখের পাতা এঁটে থাকে, তেমনিই। হেমন্তের বা শীতের দিনে দুপুরে ঘুমোলে অনেক সময় এই রকম অবস্থা হয়, চেতনা থাকে, ওঠা উচিত এবার বোঝে—উঠতে চেষ্টাও করে কিন্তু চোখ থেকে ঘুম যেতে চায় না, চোখ খুলতে পারে না।

কেন এমন হচ্ছে ভাবতে গিয়ে মাথায় যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়। সেই বমির ভাবটাও। চোখ বুজে স্থির হয়ে পড়ে থাকে আরও খানিকটা। পরে তার আস্তে আস্তে কেমন একটা দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্যর অনুভূতি হতে থাকে। বড় কষ্ট। মনে হচ্ছে কোন

কঠিন জায়গায় শুয়ে আছে। আর আছেও বোধ হয় অনেকক্ষণ এক ভাবে। নইলে এমন কষ্ট হবে কেন? তার বিছানাটা এত শক্ত হয়ে গেল কী ক'রে? বৌদি নেই, কেউ রোদে-টোদে দেয় না। রঘুটা কি করে? বকতে হবে ওকে—

কিন্তু এটা বিছানা কি! কি রকম যেন লাগছে?

উঃ—কী গরম! যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

মনে হ'ল ঘামই গড়িয়ে চোখে পড়েছিল—অন্তত জ্বালাটা সেই রকম—বন্ধ পাতার মধ্যে দিয়ে গিয়ে জ্বালা ক'রে উঠল চোখটা। তাতেই হাতটা যেন আপনিই উঠে এল চোখের দিকে, (হাত এত ভারী বোধ হচ্ছে কেন? যেন অবশ হয়ে গেছে! প্যারালিসিস হ'ল নাকি?) হাতের উল্‌টো পিঠ ক'রে চোখটা মুছতে গিয়ে আরও খানিকটা ঘাম গেল বোধ হয় চোখে—আরও জ্বালা—যার ফলেই বোধ হয় ঘুমের সেই আচ্ছন্ন-করা ভাবটা কেটে গেল, একটু একটু চোখ পিট পিট করতে করতে—চোখ জ্বালা করলে যেমন একবার খোলে আবার বন্ধ করতে বাধ্য হয়—সেই ভাবেই এক সময় চোখটা খুলে ফেলল।

কিন্তু চোখটা পুরোপুরি যখন খোলা গেল—তখন বিহ্বলতা আরও বাড়ল।

সে কোথায় এসেছে, কোথায় আছে? এ কোন্ জায়গা? সে কি জেগে আছে—না ঘুমুচ্ছে এখনও? কিছুই বুঝতে পারছ না কেন? পাগল হয়ে গেল নাকি?

আবারও ক্লান্তভাবে চোখ বুজল সে। নিজেই। ইচ্ছে করেই। মাথার যন্ত্রণা তো আছেই, সেই গা-বমি ভাবটাও। এই বিহ্বলতা ও অনিশ্চয়তাতে যেন মাথার যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেছে।

চোখ বুজে পড়ে থাকতে থাকতেই একটু একটু ক'রে মনে পড়ল সব। রঘু, রঘু কোথায়? সে চা দিচ্ছে না কেন?

এই রঘুর সূত্র থেকেই বৌদি, পুরী, দোলা, তার আপিস, মধুবাবু—একটা চেনে বাঁধা মটরমালার দানার মতো একটার পর

একটা মাথায় এসে গেল। যন্ত্রণা তীব্রতর হয়ে উঠছে, অনুভূতি বা চেতনা পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয়—তা হোক, সবই মনে পড়ছে এবার। বরকত আলী, পানওলা, সোলেমান। পান খাওয়া, তার পরই সব অন্ধকার হয়ে যাওয়া।

অর্থাৎ সে বাঘের গর্তেই পা দিয়েছিল, বোকার মতো, আহাম্মুকের মতো। মধুবাবু দেবীপদ কারও সতর্কবাণীতে কোন কাজ হয় নি—বর্তমানে সে বাঘের চোয়ালের মধ্যেই, দাঁতটা শুধু যা বসাতে বাকি।

এবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখল। একটা নিশ্ছিদ্র নিরেট দেওয়ালওলা ঘরের মেঝেতে সে পড়ে আছে। বিছানা নেই, কোন আসবাব নেই। কোথাও জানলা বা দরজা নেই। এক কোণে একটা মাটির গামলা, বোধ হয় প্রাকৃতিক কাজের জন্যে, আর এক পাশে একটা টিনে—বোধ হয় খানিকটা জল।

জানলা নেই তবে সে দেখতে পাচ্ছে কী ক'রে? নিঃশ্বাসের জন্যে বাতাসও তো দরকার?

ছাদের দিকে চাইতে সে রহস্যটাও পরিষ্কার হ'ল। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় যেমন ছাদে কতকগুলো ফুটো থাকে—তেমনিই আছে, মনে হয় ছাদটাও লোহারই। আর তেমনিই এক কোণে একটা ফুটো দিয়ে আলো এসে পড়েছে দেওয়ালে, সাদা দেওয়ালে পড়ে সেটা প্রতিফলিত হয়ে একটা আলোর আভাস সৃষ্টি করেছে। আলো খুবই কম, বোধ হয় দশ বাতি কি পনেরো বাতির বাল্‌ব্ আছে—কিন্তু নীরন্ধ্র অন্ধকারে তাই যথেষ্ট।

নিঃশ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও বাতাস নেই। অসহ্য গুমোট, তাতেই যেন যন্ত্রণা বেশী মনে হচ্ছে। ঘামে জামা প্যাণ্ট ভিজে জলের ধারার মতো মেঝেয় গড়াচ্ছে। এগুলো খোলা দরকার।

ওঠবার চেষ্টা করল—সমস্ত দেহ যেন কেমন ভারী আর অনড় হয়ে গেছে—পারল না প্রথমটায়। আরও অনেক পরে, অনেক চেষ্টায়, প্রথমে পাশ ফিরে তার পর একটা হাতে ও আর একটা

কনুইতে ভর দিয়ে শেষ অবধি উঠে বসল।

কাল যে সাংঘাতিক বিষ খাইয়েছিল—তারই ফল নিশ্চয় এটা। সবাই সব জানে, শত্রুদলের (শত্রুই বা কেন. সে প্রশ্নটাও থেকেই যাচ্ছে) পয়সা-খাওয়া লোক। পানওলা জেনেশুনেই নিশ্চয় পানে বিষ মিশিয়েছে। অজ্ঞান-অচৈতন্য করার জন্যে। কী বিষ কে জানে? তার আরও কি কুফল ভোগ করতে হবে! এ মাথার যন্ত্রণা, এই বমি ভাব—এও নিশ্চয় সেই জন্যেই।

কিন্তু ঘটনাটা কাল ঘটেছে, তাই বা ভাবছে কেন? কাল কি কদিন আগে—তাও তো জানে না। দিন না রাত্রি এটা?

কে জানে, কে বলবে! এ কী অদ্ভুত অবস্থা! কী ওদের মতলব কে জানে! এরা কারা তাও তো জানে না! হায় রে তার বুদ্ধির অহঙ্কার! অন্ধকার যেমন ছিল তেমনিই রইল—মাঝখান থেকে প্রাণটাই গেল। দোলা কিছু তার আপন মেয়ে নয়, আপন ভাইঝিও নয়—মিছিমিছি কেন যে তার এত মাথাব্যথা পড়ল! আসলে সেই ছেলেটা, ভিখিরী ছেলেটাই যত নষ্টের গোড়া।

হাত-পা আর একটু নাড়বার মতো হতে জামা গেঞ্জি সব খুলে ফেলল। হয়ত এই ভিজে জামা গায়ে থাকাতেই—ক' ঘণ্টা আছে এই ভাবে কে জানে—সর্বাঙ্গে এত ব্যথা হয়েছে। আর এই মেঝেতে পড়ে থাকা। কে জানে মাটির নিচের ঘর কি না, মেঝেয় তো জল উঠছে। তবে খুব পুরনো নয়—বোধ হয় নতুনই তৈরী হয়েছে ওদের জন্যে।

অসহ্য যন্ত্রণা মাথায়। যন্ত্রণায় ভয়ে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়—'ওঃ' বলে একটা শব্দ ক'রে উঠল নলিনাক্ষ। আবার বলে উঠল, 'মা, মাগো! আর যে পারছি না!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি অতি-পরিচিত চাপা কণ্ঠে শব্দ এল, 'আরে! নলিনীবাবু নাকি!'

দেবীপদ! এককড়ি!

কিন্তু শব্দটা আসছে কোথা থেকে? কোথাও তো ফাঁক নেই

একটাও! এক ওপরে ছাড়া। মনে হচ্ছে সেইটেই যাতায়াতের পথও। সেকালের চাপা দরজার মতো।

'দেবীপদ? তুমি কোথায়? কোথা থেকে কথা কইছ?'

'চুপ। আস্তে কথা বলুন। ঐ যে গামলা দেখছেন, ওটা সরান, দেখবেন একটা ছোট্ট নর্দমা। আমি আপনার পাশের ঘরে ঐ নর্দমায় কান পেতে আছি। ঐ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে সরু নালার মতো কাটা আছে মেঝেতে, জল বেরোবার পথ। গামলাটায় ঢাকা আছে নর্দমাটা। চলে আসুন, এইখানে মুখ দিন, কথা বলার অসুবিধা হবে না।'

আশ্চর্য মানুষের মনের গতি, পরে ভেবে নিজেরই অবাক লাগে নলিনাক্ষর। সে প্রথম প্রশ্নই করে বসল, 'আচ্ছা এখন কটা বাজে বলতে পারো, দিন না রাত? আমি কতকাল আছি এখানে?'

'কেন, আপনার হাতে ঘড়ি নেই?'

'না, দেখছি না তো।'

'তাহলে যে ব্যাটা ধরেছিল আপনাকে, সেই নিয়েছে। আমারটা আছে। তবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আন্দাজে চালিয়েছি। মোদ্দা কুড়ি ঘণ্টা হয়ে গেছে। আপনি কটায় এসেছিলেন? সাড়ে সাত পৌনে আট? তাহলে এখন বিকেল চারটে বাজে।'

'তুমি কি ভাবে এলে এখানে? কত দিন আছ?'

'তা হ'ল বৈকি! সেই যে ভাঙা বাড়িটার পাশে দেখা হয়েছিল মনে আছে? পুরীতে? যেই আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেওয়ালটার এ পাশে এসেছি, একটা চট দিয়ে আমার মাথাটা ঢেকে মুখে দড়ি বেঁধে দিলে—তার পর তিন-চার জন ধরে এনে নিমেষের মধ্যে চাকলাদারের গাড়ির ক্যারিয়ারে পুরে বন্ধ ক'রে দিলে! ভেরী নীট ওআর্ক।...সব সুদ্ধ বোধ হয় এক মিনিটও না। আমার গাড়োলগুলি পাহারা দিচ্ছিলেন, মানে দেবারই কথা, নজর রাখার কথা অন্তত—কেউ টের পেল না।...আপনি ঐ পথেই বাড়ি যাবেন জানি, তখনই উঠবেন—তাই যতটা পারি গোঁ গোঁ ক'রে চেঁচাবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু

আপনিও শুনতে পেলেন না।—'

'শুনতে পেয়েছিলুম ঠিকই—কিন্তু এ ধরনের ব্যাপার যে কল্পনাই করতে পারি নি। আপনার সঙ্গে অত পুলিসের লোক! আমি ভেবেছি বাতাসের শব্দ।'

নলিনাক্ষ খুলে বলল ওর অভিজ্ঞতা। তার পর থেকে কি কি ঘটেছে তাও সংক্ষেপে বলল। মধুবাবুর কথা। ওর ভাইপো-চুরির কথা। পরেশ চাকলাদারের কথা। দেবীপদর নাম ক'রে গাড়ি পাঠাবার কথা। কেন ও কি ভাবে এখানে এল, তাও।

দেবীপদ চুপ ক'রেই শুনে গেল। তারপর বলল, 'হুঁ। ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। আমিও এসব শুনেছি—তবে ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। মানে সত্যি, না কি আমি কান পেতে আছি জেনেই বানিয়ে বলছে, সেইটেই ঠিক করতে পারছিলাম না।'

'তুমি শুনলে কি ক'রে? তোমার বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে নাকি? এ তো সেই মধ্যযুগের ডানজন।'

'তা বটে। তবে তত ভয়ানক নয়। আলোটা দিয়েছে দয়া ক'রে আর এখনও ইঁদুরে তাড়া করে নি। মনে হয় এটা অপেক্ষাকৃত নতুন।'

একটু অসহিষ্ণু হয়েই নলিনাক্ষ পুনশ্চ বলে, 'কিন্তু তুমি শুনলে কি ক'রে তা তো বলছ না?'

'ঠিক এই ভাবেই। এটা আমরা আছি মাটির নিচের ঘরে। ওপর থেকে সিঁড়ি ফেলে নামিয়ে দেয়; আবার যদি কোন দিন আমাদের তুলতে হবে মনে করে তাহলে ঐ ভাবেই তুলে নেবে। তবে আমার এ পাশের ঘরে মনে হচ্ছে একটা সিঁড়ি আছে। ঘরটাও বড়, ওদের কথার ভাবে যা মনে হয়—কারণ অনেক মাল আছে এতে। এটাই ওদের কনফারেন্স রুম-মতো, অনেক আলোচনা হয়, যেগুলো প্রকাশ্যে করা যায় না, মানে সামান্য দু-এক জনের বাইরে যা কাউকে জানাবার নয়। নিরেট দেওয়াল মধ্যে, এই ভেবেই ওরা নিশ্চিন্ত আছে, নর্দমার কথাটা কারও মাথাতে যায় নি। তাতেই শিখলাম

অনেক।'

'তা তুমি বেঁচে আছ কি ক'রে? তোমাকে খাবার দেয়?'

'এখনও দিচ্ছে। বোধ হয় তোমাকেও দিত, জ্ঞান হয় নি ভেবেই নিশ্চিন্ত আছে।'

'কি ভাবে দিচ্ছে?'

'ওপরের চাপা দোর খুলে একটা তারের ট্রের মতো নামিয়ে দেয়। তাতে দুটি বস্তু থাকে এক সঙ্গে—জল আর খাবার। আর একটু পরেই একটা গামলা নেমে আসে, সেটা নামিয়ে ঘরের গামলাটা তাতেই তুলে দিতে হয় নিজের হাতে। খুব সায়েন্টিফিক আর মেথডিক্যাল। তবে বেশীদিন খেতে দেবে না আর।'

'তার মানে?'

'মনে হয় তোমার—মানে আপনার জন্যেই—'

'তোমারই হোক না, আমি তো তুমি ক'রে নিয়েছি, তুমি এখনও দূরত্বটা রাখছ কেন?'

'তা বটে, মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে ওসব ফর্মালিটির দরকার নেই আর।···যা বলছিলুম, ওরা তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল, এবার নাকি এখান থেকে সবাই চলে যাবে, ভেকেট করবে। মাল, মানুষ —যা নিয়ে যাবার সব সরে গেলে তালা বন্ধ ক'রে রেখে সরে পড়বে। আমরা এইখানে শুকিয়ে মরব। দীর্ঘকাল পরে কেউ, হয়ত যদি দোর ভেঙে ঢোকে—সে সম্ভাবনা কম, কারণ পরেশ চাকলাদারই এর মালিক—ঢুকলেও মাটির নিচের এ মহলের সন্ধান পেতে দেরি হবে— আর যদিই পায়, দুটো কঙ্কাল থেকে কে কী বুঝবে?'

দেবীপদ খুব সহজ ভাবেই, যেন একটু কৌতুক ক'রেই বলল, কিন্তু কল্পনায় দৃশ্যটা দেখে—এই মাটির নিচে হয়ত পঞ্চাশ কি একশ' বছর পড়ে থাকবে কঙ্কালগুলো, কেউ জানতেও পারবে না—নলিনাক্ষ শিউরে উঠল। এই প্রথম, তার যেন কান্না পেয়ে গেল। কেন মরতে এ কাজ করতে এল সে! এই শোচনীয় ভাবে তিলে তিলে পলে পলে শুকিয়ে মরা!

'কী, ভয় পেয়ে গেলে নাকি ?'

'তোমার ভয় করছে না ?'

'যেদিন থেকে এ-কাজে এসেছি সেদিন থেকেই তো মৃত্যুর হাত ধরেছি। কতবার মরতে মরতে বেঁচেছি। এবার না হয় বাঁচতে বাঁচতে মরব। শুধু শুধু ভয় ক'রে লাভ কি বলো ?'

'কিন্তু পরেশ চাকলাদার তোমাকে ধরল কেন ? সে তো—সে তো শুনলুম অন্য ব্যবসায়ে ছিল।…হ্যাঁ, সেও ধরা পড়েছে জানো ? স্মাগলিং-এর জন্যে, বমাল ধরা পড়েছে।'

'ধরা পড়ে নি, ধরা দিয়েছে।'

'তার মানে ?'

'তার মানে এই দায়, মধুবাবুকে খুনের দায়—এতগুলো থেকে বাঁচতেই ধরা দিয়েছে। কে জানে মধুবাবুর জন্যে ওর দলের লোকই নারাজ হচ্ছিল কিনা, প্রাণের ভয়েই আরও ধরা দিয়েছে। এসব কাজ করার পর বাঁচতে গেলে পুলিসের ঘরে থাকাই সুবিধা।'

'মধুবাবুকে ও-ই খুন করেছে, না ? লোকটাকে আমরা কিন্তু আগাগোড়া সন্দেহ করছিলুম—'

'কিচ্ছু ভুল করো নি। মধুবাবুই পালের গোদা। অর্থাৎ মানুষ-খেকো ব্যবসা তারই।'

'তার মানে ? একই প্রশ্ন বার বার করছি—কিন্তু আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। এত যন্ত্রণা হচ্ছে মাথার—'

'একটু জল খেয়ে নাও। মাথাতে একটু জল থাবড়ে দাও। জল কাল তোমার সঙ্গেই নেমেছে তা টের পেয়েছি। শুধু কাকে ধরে আনা হ'ল সেটা ওদের কথাবার্তার মধ্যে ঠিক বুঝতে পারি নি।'

নলিনাক্ষ একটু সুস্থ হয়ে আবার নর্দমায় কান পাতলে দেবীপদ সংক্ষেপে—যতটা জানে—এই রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করল।

জানার দিক থেকেও একটু সুবিধা হয়ে গেছে। যে লোকটা খাবার দিতে আসে, ভবানী হালদার নাম, এর আগে একটা ডাকাতি

মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল, প্রমাণ সাক্ষী সবই ওর বিরুদ্ধে, দেবীপদই শেষ মুহূর্তে বাঁচিয়ে দেয়—আসল যারা যারা ছিল খুঁজে বার ক'রে। এর আগে এ কাজ অনেকবার করলেও সে ডাকাতিতে ভবানী ছিল না—কিন্তু হাতের কাছে একটা দাগী আসামী পেলে কে আর অত গরজ ক'রে তার পরেও তদন্ত চালিয়ে যায়! সেই ডাকাতিতে মানুষ খুন হয়েছিল, যারা শেষে ধরা পড়ল তাদের সকলেরই 'লাইফ সেন্টেন্স' হয়েছে—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যাকে বলে। তাতেই ভবানী হালদার ও লাইন ছেড়ে দিয়েছে, এদের চাকরি করে। জাতে নমঃশূদ্র, বলে, 'ডাকাতিই আমাদের জাত ব্যবসা, তা বুড়ো হয়েছি, এখন একটুকু ভয় ধরেছে প্রাণে। এখানে আমি তো হাতে-কলমে কিছুকরি না, যদি দৈবে ধরা পড়িও, বড় জোর কিছু দিন জেল হবে—ফাঁসির দড়ি তো আর পরতে হবে না গলায়।'

সেই ভবানীই কিছু কিছু বলেছে। আর কিছু কিছু নর্দমার ফুটোয় কান দিয়ে শুয়ে শুয়ে শুনেছে দেবীপদ।

মানুষ চালান ব্যবসাটা দু রকম হয়। বয়স্কা মেয়ে চালান হয়, বয়স্ক পুরুষও চালান হয়—তেরো-চোদ্দ থেকে উনিশ-কুড়ি পর্যন্ত—এদের বিক্রী ক'রে দেওয়া হয় বাইরে। পুরুষরা ক্রীতদাস হিসাবে কাজ করে, মেয়েদের দুরকমেই খাটতে হয়। তবে এর চাহিদা এত নেই, আর ঝুঁকিও বেশী। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ওয়াকিবহাল লোক ছাড়া এসব কাজ পারে না। মধুবাবুর এই ব্যবসাই বেশী ছিল। কেরালা থেকে গুজরাট, ওদিকে পাঞ্জাব, রাজস্থান—সর্বত্রই তার অংশীদার ছিল, মিলেমিশে কাজ করত। অর্গানাইজ করা যাকে বলে, সে ক্ষমতা নাকি মধুবাবুর ছিল অসাধারণ। তাই লেখাপড়া তেমন না জানলেও সকলে তাঁকে কেন্দ্রশক্তি হিসেবেই দেখত।

এছাড়া আর একটা ব্যবসা—ছোট ছেলেপুলে এনে বিকলাঙ্গ ক'রে তাদের দিয়ে ভিক্ষে করানো। এরা ছোট বয়স থেকেই ওদের মনে এমন ভয় ঢুকিয়ে দেয়—এমন সব পদ্ধতি আছে ভয় দেখানোর যে—আতঙ্কটা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে, ভিক্ষার সব টাকা এনে মালিককে

ধরে দেয়, পালাবার বা এ অধীনতা ছিন্ন করার চেষ্টা মাত্র করে না। তাছাড়া অনেকে জানেও না যে তাদের ইচ্ছে ক'রে নৃশংসভাবে এই রকম করা হয়েছে—কাউকে কানা, কাউকে খোঁড়া, কাউকে গন্না-খ্যাঁদা ; কারও বা হাত কেটে দেওয়া হয়েছে, কারও বা আঙুল। তারা জানে দৈবদুর্বিপাকেই এমন অবস্থা হয়েছে তাদের, এরা দয়া ক'রে না বাঁচালে বাঁচত না, তাদের কেউ কোথাও নেই, কেউ দেখার ছিল না, এরাই আশ্রয় দিয়েছে তাই বেঁচে আছে।

অবশ্য তা সত্ত্বেও কড়া নজর রাখতে হয়। অন্ধকার কালো পথে উপার্জনের নিয়মই এই। অহরহ সতর্ক সজাগ থাকতে হয়। দু-চার জন যে মাঝেমধ্যে বিদ্রোহ করার চেষ্টা না করে এমন নয়—সেক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবেই কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। সেই রকমই দেওয়া হয়েছিল কেলোকে—প্রফুল্ল বা হামিদ—সেই খোঁড়া ছেলেটিকে। অবশ্য তার দোষ ছিল না, কিন্তু এরা ভেবেছিল নলিনাক্ষ আসলে পুলিসের স্পাই, টাকা দিয়ে আইসক্রিম খাইয়ে ওর কাছ থেকে খোঁজ-খবর আদায় করছে। কেলোর পরিণাম দেখেই এখন বহুদিন পর্যন্ত বাকী ভিখিরীরা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে।

মুশকিল হয়েছে এই, এই সব ব্যবসা 'ইণ্টারন্যাশনাল গ্যাঙ' চালায়, এমনি একটা আবছা ধারণা আছে সকলের। পুলিসেরও। বিরাট ব্যাপার, সে কি আর আমাদের ধরা সম্ভব, এই ভেবে হাল ছেড়ে দিয়েছেন অনেকেই। কিন্তু দেবীপদ যেটুকু জেনেছে, আসলে বহু দল, আলাদা আলাদা ব্যবসা। ব্যবসার সম্পর্ক হিসেবেই কেরালার দলের সঙ্গে আসামের, রাজস্থানী দলের সঙ্গে তেহরাণের, বাংলার দলের সঙ্গে মার্কিন দলে যোগাযোগ। নিছক ব্যবসা। একটা দল হ'লে কবেই ধরা পড়ত। অনেক দল, আর এরা নিজেদের স্বার্থেই ব্যবসার একটা মোটামুটি সততা বজায় রেখে যায়—দু-একজন চালাকি করতে যায় না তা নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাকী সকলে নিপুণভাবে তাকে 'খতম' ক'রে দেয়, সেই ভয়ে আবার কিছুদিন সবাই টিট্ থাকে। আর নিজেদের স্বার্থেই মন্ত্রগুপ্তিটা রক্ষা করে, কেউ কারও

কথা ফাঁস করে না।

মধুবাবুর শক্তিও বেশী, উচ্চাশাও বেশী। তিনি মানুষের ব্যবসা থেকে কোকেন মারিজুয়ানা, সোনা-হীরের চোরাকারবারে লিপ্ত হবেন সেটা স্বাভাবিক। মধুবাবু আসলে বহু দলের অভিভাবক উপদেষ্টা ছিলেন। সে হিসেবেও কিছু কিছু পেতেন। কিন্তু লেখাপড়া, বিশেষ ইংরেজীটা কম জানতেন। সেই জন্যেই পরেশ চাকলাদারকে তাঁর দরকার হয়েছিল। চাকলাদার একটা বড ব্যাঙ্কে কাজ করত, সেখান থেকে লাখ তিনেক টাকা সরাতে গিয়ে ধরা পড়ে। আলিপুর না নিউ আলিপুর ব্রাঞ্চে—ডাকাতির আয়োজন করে। অয়োজন নিখুঁত। ভুল হয়েছিল একটা আনাড়ী লোককে দলে নেওয়ায়। দলের সুপারিশেই নাকি নিতে হয়েছিল তাকে। তাতেই শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ল।

সেই সময় এলেন মধুবাবু। নিজে যেচে এসে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। কিছু মোটা টাকারও দরকার হয়েছিল—সেও মধুবাবু পকেট থেকে খরচ করেন। সেই সঙ্গে একটি নিজের হাতে লেখা স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেন পরেশকে দিয়ে—ভবিষ্যতে হাতে থাকবে বলে। সে স্বীকারোক্তি কোন ব্যাঙ্কের ভল্টে আছে। কোন চালাকি করতে গেলেই সেটি পুলিসের হাতে চলে যেত। পুলিসকে গুলি করেছিল নিজের হাতে, সে জখম হয়েছিল—মরে নি, তবু 'য়্যাটেম্পট্ টু মার্ডার' আর সরকারী লোককে কর্তব্য পালনে বাধা দেওয়া, ডাকাতির চেষ্টা—এতগুলো চার্জে শাস্তি বড় কম হ'ত না।

পরেশ চাকলাদার চলনে বলনে পাকা সাহেব। ইংরেজী ছাড়াও ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান শিখে নিয়েছিল। ওদের ব্যবসার জন্যে এগুলো দরকার। মধুবাবু ওকে প্রথমে নিজের সহকারী হিসেবে নিলেন, শেষে অংশীদার ক'রে ছিলেন। টাকাকড়ির ব্যাপারে খুব সাফ ছিলেন তিনি, শতকরা ত্রিশ টাকা দেবার কথা—পাই পয়সা পর্যন্ত হিসেব ক'রে দিয়ে দিতেন। কিন্তু পরেশ চাকলাদার চাইত যেমন উপার্জন তেমনিভাবে থাকতে—ধনীর মতো থাকার বড় শখ তার, আসলে সেই জন্যেই

ব্যাঙ্ক লুঠ করতে গিয়েছিল। কিন্তু মধুবাবু জানতেন এইভাবে পয়সা খরচ করতে থাকলে একদিন না একদিন লোকের চোখে পড়বে, তাদের চোখ টাটাবে। আর তাহলেই পুলিসেরও নজরে পড়বে।

তাই পড়েও ছিল, দেবীপদ আসলে পরেশ চাকলাদারেরই পিছু নিয়েছিল। পরেশ যেমন নির্মম তেমনি বেপরোয়া, তাই দেবীপদ খুব সাবধানেই ছিল—তবু শেষরক্ষা হ'ল না।

নলিনাক্ষর এ-জালে জড়াবার কথা নয়, সে নিজের অজ্ঞাতসারেই এসে পড়েছিল। প্রথম ঐ ভিখিরী ছেলেটার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ, ওরা ভুল বুঝে তাকে মারল। আর তার ফলটা অন্যভাবে এসে পড়ল নলিনাক্ষর ওপরই। ছেলেটা চেহারার জন্যেই বেশী রোজগার করত, সে উৎসটা বন্ধ হয়ে যেতে ওদের জাতক্রোধ হল নলিনাক্ষর ওপর। পরেশের সামনের বাড়িতে থাকে ও, ক্রমশ প্রকাশ পেল দেবীপদর বন্ধু। এর আগে বড় স্মাগলার গ্যাঙ একটাকে খতম করার মূলেও এই নলিনাক্ষই ছিল—অবশ্য সেও অজান্তে—কিন্তু কে আর অত খবর রাখছে—ওরা দুই আর দুইয়ে চার ধরে নিল। তারপর পুরীতে গিয়ে পড়া—এরা গিয়ে পড়ল দৈবাৎই। কিন্তু মধুবাবু ও পরেশ ধরে নিল যে দেবীপদর চর হিসেবেই গেছে নলিনাক্ষ। দেবীপদ যে পুরীতে আছে তা জানত—সুতরাং এটা ধরে নেওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিরাট একটা সোনার চালান ডেলিভারী নিতেই গিছল পরেশ, পরেশকে সামলাতে মধুবাবু।

মধুবাবু দেবীপদ আর নলিনাক্ষর উপস্থিতির কার্যকারণ ভেবে নিয়ে পরেশের ওপর চটে গেলেন খুব। তিরস্কার করলেন। ওর জন্যেই এদের চোখ পড়ল, নইলে এতদিন তিনি এত কারবার করছেন, কেউ তো সন্দেহ করে নি।

পরেশের যুক্তি হচ্ছে, যদি ভোগই না করলুম তো এত কাণ্ড কষ্ট ক'রে, এত ঝুঁকি নিয়ে রোজগার ক'রে লাভ কি? চিরদিন গর্তের মধ্যে থেকে ছুঁচোর জীবন যাপন করা—সে তো একটা দুশো টাকা

মাইনের কেরানীও পারে। মধুবাবু বলেন, যথেষ্ট টাকা ক'রে নিয়ে তুমি বিলেত আমেরিকা যাও না, রিভিয়েরাতে গিয়ে ফুর্তি করো, এখানে ওসব চাল দেখাবার দরকার কি ?

দোলাকে যে ধরে সে নিতান্তই দৈবের যোগাযোগ। নলিনাক্ষর আত্মীয় বলে জানত না ওরা। জানার কারণও ছিল না। যখন জানল —পরেশ চেয়েছিল ফিরিয়ে দিতে, মধুবাবুই নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'দ্য মিস্‌চীফ্‌ ইজ অলরেডী ডান—এখন ফিরিয়ে দিলে আরও ঝুঁকি নেওয়া। মেয়েটা কতটা কি লক্ষ্য করেছে কে বলতে পারে! ছোটদের অবজার্ভেশন অনেক তীক্ষ্ণ, কি বলবে তা কে জানে। আর ঘাঁটিও না।'

সে রাত্রে বাস য়্যাক্সিডেণ্ট মধুবাবুরই ব্যবস্থা। শেষ মুহূর্তে যে নলিনাক্ষ ট্রেনে আসবে তা ভাবেন নি। নিরাপদে কলকাতায় পৌঁছে গেছে—একথা শুনে তিনি স্থির থাকতে পারেন নি। দেবীপদকে ধরা হয়েছে, এখন নলিনাক্ষকেও যদি এই খাঁচায় এনে পোরা যায় তাহলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। এখান থেকে কাঠের বাক্স ক'রে অনেক মাল ওরা চালান করে, তখন স্থির ছিল এদের দুজনকে সেইভাবে পাঠাবে। মাঝসমুদ্রে গিয়ে বাক্স দুটো ডুবিয়ে দেবে তারা।

সেই সঙ্গে মধুবাবু আর একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন পরেশকে। এখানের 'য়্যাক্‌টিভিটি' কাজকর্ম কিছুদিনের জন্যে বন্ধ রাখতে। পরেশকে বলেছিলেন উটকামণ্ডে গিয়ে একটা য়্যান্টিক জিনিসের দোকান খুলতে। মধুবাবু নিজে চলে যাবেন বাংলাদেশে, পাসপোর্ট করানোই আছে, তাতে বাধবে না। সেটাই পরেশের পছন্দ হয় নি। এখানে এখন বিস্তর কাজ—'বিজনেস' ওদের ভাষায়। অনেক টাকা আমদানি হচ্ছে, সব এদের হাতে ছেড়ে চলে যাবে, যদি এর পর ফিরে এলে পাত্তা না দেয়!

কিছুদিন ধরেই মধুবাবুর কর্তৃত্ব পরেশের অসহ্য লাগছিল, তা ছাড়াও, তার মনে হয়েছিল কাজকর্ম সব সে-ই করছে, মাঝখান থেকে

সিংহভাগ নিচ্ছেন মধুবাবু। পরেশ চিরদিনই বেপরোয়া, সে দুম ক'রে মধুবাবুকে খুন ক'রে বসল। করল—মানে করালো। সেও আর একটা ভুল। এ বিষয়ে মধুবাবুর নীতি ছিল খুব পরিষ্কার : 'খুব দরকার না পড়লে মানুষ মেরো না। বিশেষ যাদের পিছনে অনেক আত্মীয় বান্ধব আছে তাদের একেবারে নাচার না হলে মারবে না। আর, মারতে হলে অনেককে জড়িয়ে মারবে, যাতে কেউ ব্ল্যাকমেল করার সুযোগ না পায়।'

পরেশ নিজেকে খুব চতুর ভাবত। মধুবাবু নলিনাক্ষকে এই পাড়ায় এনে ফেলার জন্যে—পাড়ায় এলে খাঁচায় পুরতে আর কতক্ষণ—আত্মীয়তার ঐ অভিনয়টা করতে গিছলেন, অনেকটা সফলও হয়েছেন—এটুকু মনস্তত্ত্ব তাঁর জানা ছিল—কিন্তু সে খবর পাবার পর পরেশের মনে হয়েছে যে মধুবাবু সবটা বাংগলিং করছেন, তাঁর আর বাঁচার প্রয়োজন নেই। তার নিজের ভাষাতেই—পাশের ঘরে বসে বলেছে পরেশ, নিজে কানে শুনেছে দেবীপদ—'ভদ্রলোক বড় বেশী ওভারবিয়ারিং হয়ে পড়েছিলেন, এসব কাজে এ-ধরনের লোকের আর থাকা উচিত হত না।' এ পাড়ায় নলিনাক্ষ এলে কি করতে হবে তা মধুবাবু আগেই ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। পরেশের মনে হয়েছিল এই দুজন এবং মধুবাবু মরে গেলেই সে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু মধুবাবুর মরার পর এদের এই জগতে খুব বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এতটা আশঙ্কা করে নি পরেশ, কল্পনাও করে নি। এদের ভালবাসা স্বার্থের ভালবাসা অবশ্য, মধুবাবু তাদের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন, কেন্দ্রমণি। তিনি এভাবে হঠাৎ চলে যেতে এরা খুব অসহায় বোধ করল। তাদের ক্ষোভ ক্রমশ রুদ্র রূপ ধারণ করছে দেখে পরেশ ভয় পেয়ে গেল, চোরাই মাল এনে ঘরে তুলে পুলিসে খবর দিয়ে সাধ ক'রে ধরা দিলে পুলিসে। একটা গোলমাল ক'রে এ দায় থেকে বছর খানেকের মধ্যে বেরোতে পারবে এ ভরসা ওর আছে, ততদিনে এদিকটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সেও ভুল পরেশের, সে গোলমাল মধুবাবুই করিয়ে দিতে

পারতেন, তাঁরই যোগাযোগ বেশী ছিল। এসব বুঝতেনও ভাল। তাঁরই পরামর্শে ও বন্দোবস্তে পরেশের সব কটা গাড়ির তিন চারটে ক'রে নম্বর করানো ছিল, পুরী থেকে যখন নলিনাক্ষকে নিয়ে আসে তখন নির্জন রাস্তায় পড়ে অন্য গাড়িতে তুলে দেওয়া হয় ওকে—সে-গাড়িতে পুলিসের ইউনিফর্ম পরা লোক ছিল—দেখলেও কেউ সন্দেহ করত না। পরেশ সোজা এসে এ-বাড়িতে উঠেছে—ওর গাড়ি যারা লক্ষ্য করেছে এখানে, তারা কিছুই সূত্র পায় নি।

এই পর্যন্ত বলে বোধ হয় ক্লান্ত হয়েই চুপ করল দেবীপদ।

নলিনাক্ষ বলল, 'তারপর? আমাদের কি উপায় হবে?'

'বোধ হয় কিছুই হবে না। মধুবাবুর মৃত্যু পরেশ চাকলাদারের ধরা পড়া—এ দুটোতে এরা খুব যেন শেকী হয়ে গেছে। এখানের চাটিবাটি গুটোচ্ছে। ছেলেমেয়েগুলো—গোটা কুড়ি এখনও এ-বাড়িতেই আছে, আপনার দোলাও—তাদের ডিস্‌পোজ্‌ ক'রে এরা সরে পড়বে, আমাদের এখানে ফেলে। ইনক্রিমিনেটিং যা কিছু সব নষ্ট করা হচ্ছে কাল থেকে। কাগজপত্র পোড়ানো হচ্ছে। প্রত্যেক গাড়িতেই দু-তিনটে ক'রে নাম্বার প্লেট ছিল, সেগুলো য়্যাসিড দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে। এখানের ম্যানেজার একটি য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান—য়্যাণ্টনী, তার সহকর্মী মঞ্জুর হোসেন—দুজনেই খুব শান্ত টাইপের লোক, কিন্তু একেবারেই নির্মম। তাদের কাছ থেকে কোন হিউম্যান কনসিডারেশ্যন আশা করা নির্বুদ্ধিতা। এখন ভরসা শুধু দৈব—এক ভগবান যদি বাঁচিয়ে না দেন তো আর আমাদের বাঁচার কোন আশা নেই। আজও আমার খাবার দিয়ে গিছল, চারখানা রুটি আর একটু আলুসিদ্ধ—কিন্তু তখনই হালদার জানিয়ে গেছে—আর বোধ হয় দেওয়া যাবে না।'

॥ ১২ ॥

এর পর দুজনেই চুপ ক'রে গেল। দেবীপদ শ্রান্তিতে, নলিনাক্ষ অন্য কারণে। মৃত্যুদণ্ড শোনার পর আসামীর কি অবস্থা হয়—আজ নলিনাক্ষ কিছুটা বুঝল। জীবন্ত সমাধি কথাটা শোনাই ছিল এতকাল, কথার-কথা হিসেবে। তার জীবনেই যে এই অবস্থা হবে, এই বয়সেই—কে জানত!

সে নর্দমার কাছ থেকে সরে এসে ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজল।

না, ঘুম আসার কোন সম্ভাবনা ছিল না। মানসিক অবস্থা ঘুমের অনুকূল নয়। অন্য কারণও দেখা দিল। দুজনেই স্থির হয়ে আছে, এখানে অন্তিমকালের নীরবতা যাকে বলে—কাজেই মাথার উপরের সামান্য শব্দও কানে আসছে। কিছু কিছু আগেও পাচ্ছিল, এখন যেন কাজকর্ম, বহু লোকের চলাফেরা, মালপত্র টানাটানি করার শব্দ আরও বেড়ে গেল। ভারী ভারী জিনিসপত্র, কাঠের প্যাকিং বাক্স গোছ—সরাচ্ছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে মেঝের ওপর দিয়ে—মনে হ'ল। খিদেতে বিষের প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে, তবু এই সব শব্দের অর্থ বুঝেই নলিনাক্ষ আরও যেন সেদিকে কান পেতে থাকে।

হিসেব মতো—মানে দেবীপদর ঐ কুড়ি ঘণ্টার হিসেব যদি ঠিক হয়, রাত আটটা নাগাদ এই কর্মচঞ্চলতা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠল। তার পর আস্তে আস্তে আবার যেন স্তিমিত হয়ে এসে সব নিথর হয়ে গেল। এ নৈঃশব্দ্যের একটিই অর্থ হয়—এরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ পরে—রাত এগারোটা নাগাদ পাশের ঘরে খুট ক'রে একটা শব্দ হল। যেন লোহার চাপা দোরটা খুব সন্তর্পণে খুলেছে কেউ। নলিনাক্ষ প্রায় গড়িয়ে এসে আবার নর্দমায় কান দিল।

'বোসবাবু, বোসবাবু।' চাপা গলায় কে ডাকছে।

'হালদার? বলো।'

দেবীপদ তো বেশ সহজভাবেই কথা কইছে, ওর কি একটুও ভয় হয় নি—সত্যিই ? মনে মনে বলে নলিনাক্ষ।

'বাবু, কী বলব, আমরা চলে যাচ্ছি। সব মাল চলে গেছে, ওপর-তলায় চাবি দিচ্ছে—এখনই নিচে এসে পড়বে। মেন সুইচ্ অফ করা হবে, আর আলোও পাবেন না। আমার কাছে একটা বাড়তি টর্চ ছিল, আর দেশলাই। রাখুন—কী-ই বা হবে এতে, তবু ইঁদুর কি সাপখোপ এলে দেখতে পাবেন। আর এই এক প্যাকেট বিস্কুট। কিছু মনে করবেন না বাবু, আমি চললুম !'

'তুমি, তুমি কি কিছুই করতে পারো না ? কোনমতে বার ক'রে দিতে— ? এখন তো সবাই ব্যস্ত। অন্তত ওপরেও যদি রেখে যেতে পারতে ! একদিন না একদিন এদের সকলকেই জবাবদিহি করতে হবে হালদার, সেদিন আমি তোমার দিকে হতে পারতুম।'

'সব জানি বাবু—কিন্তু চারদিকে কড়া পাহারা। আণ্টুনী সায়েব নিজে এই সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। আমার ঘাড়ে একটাই মাথা বাবু। আপনাদেরও বাঁচাতে পারব না, আমি নিজেও যাবো—'

সে সরে গেল, চাপা দোরটা আবার বন্ধ ক'রে দিয়ে।

আর একটু পরে হঠাৎই আলোটা নিভে গেল।

গাঢ়, নিঃসীম অন্ধকার। অন্ধকার যে এমন নিশ্ছিদ্র হতে পারে তা কে জানত !

নলিনাক্ষ না অন্ধকার দেখতে গিছল সমুদ্রের ধারে—শখ ক'রে ? মনে আছে—প্রথম যেদিন নামছে সমুদ্রের দিকে, সেই রাত্রিবেলা—ঐ পরেশ চাকলাদারের মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, শাখী বুঝি নাম মেয়েটার—বলেছিল, 'অন্ধকার দেখতে যাচ্ছেন ? শখ বটে বলিহারী আপনার ! অন্ধকার আবার কি দেখার আছে, ওটা মরবার জন্যে রেখে দিন না ! আলো আর ক'দিনের, যে কটা দিন বাঁচি আলোতেই যেন কাটিয়ে দিতে পারি—আমি তো এই বুঝি !' তখন ডেঁপোমি মনে হয়েছিল। আজ কথাগুলোর অর্থ বুঝছে !

নলিনাক্ষ আর সামলাতে পারল না, সত্যিই হাউ হাউ ক'রে

কেঁদে উঠল। অনর্থক বুঝেই দেবীপদ ওঘর থেকে কোন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল না।

*　　　*　　　*

ক্লান্তি তো ছিলই, অপরিসীম ক্লান্তি, অনাহারের দুর্বলতা। তার ওপর এই বুকফাটা কান্না। ফলে অবসন্ন হয়েই এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল নলিনাক্ষ। গভীর স্বপ্নহীন ঘুম, দীর্ঘ উপবাসের পর ঘুমোলে যেমন গাঢ় ঘুম হয়—তেমনিই। সেই জন্যেই ঘুম ভাঙতেও দেরি হল। শব্দ পাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকেই বোধ হয়, প্রথম সেটা স্বপ্ন বলেই মনে হয়েছিল, তারপর এক সময় কথাটা মনে পড়ল—যে স্বপ্ন দেখে তার তো স্বপ্ন মনে হয় না। তবু তখনও চোখ খুলতে পারে না, চোখের পাতা যেন জুড়ে আছে। শেষে এক সময় প্রচণ্ড কী একটা শব্দ, কে যেন কোন দরজায় লাথি মারছে, চমকেই চোখ চাইল—

দেখল ঘরে আলো জ্বলেছে আবার।

সত্যি? না স্বপ্ন দেখছে!

আশার আলো? জীবনের আলো?

মাথার ওপর বহু লোকের পায়ের শব্দ না? খুব চেঁচামেচি—সে শব্দ এখানেও কিছুটা এসে পৌঁচচ্ছে। দরজায় লাথির পর লাথি মারছে কে। তার পর যেন পাশের ঘরে ওপরের চাপা দোর খোলার শব্দ, 'দেবীদা, দেবীদা—দেবীদা জেগে আছেন?'

দেবীপদ সাগ্রহে সাড়া দিল, 'কে প্রবীর? তোমরা এসেছ? তাই তো বলি—'

'হ্যাঁ দেবীদা, আমরা সবাই এসে পড়েছি। কমিশনার নিজে এসেছেন, আমাদের বড়সাহেব। আর ভয় নেই।'

'পাশের ঘর প্রবীর, আগে পাশের ঘর দেখ। নলিনাক্ষবাবুকে রেখেছে ওখানে, বড় কাতর হয়ে পড়েছেন।' দেবীপদ বলল, 'প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা ওঁর পেটে কিছু পড়ে নি।'

'এই দরজাটা—না? তাও তো বটে। এই তো দরজা একটা। খোলো খোলো মোহন, চাড় দাও, চাবি খুঁজে খুলতে অনেক দেরি

হবে। সিঁড়িটা ফেলে নেমে যাও দুজন, যদি অজ্ঞান হয়ে থাকেন তো ধরাধরি করে তুলতে হবে। শৈলেন তুমি যাও, ব্র্যাণ্ডি আছে তোমার কাছে—। অফ কোর্স, আজ নলিনাক্ষবাবু শুড বি আওয়ার ফার্স্ট কনসিডারেশ্যন্। হি ডিজারভ্‌স্ ইট। দেবীদা, সেবার আপনার জন্যে উনি বেঁচেছিলেন। এবার ওঁর জন্যে আপনি বাঁচলেন।'

এ সব কি সত্য, না স্বপ্ন দেখছে নলিনাক্ষ?

ওপরে এসে বসে চা, খাবার ও ক চামচ ব্র্যাণ্ডি খেয়ে একটু সুস্থ হলে দেবীপদ জিজ্ঞাসা করল, 'তার পর? তখন যে কথাটা বললে প্রবীর—'

'আপনাকে আপনার সঙ্গীরা মিস করেছিল অন্ধকারে। আপনি কোথাও ঘাপ্‌টি মেরে আছেন ভেবে পরের দিন সকাল পর্যন্ত কোন খোঁজ করে নি। তার পর সন্দেহ হতে, চাকলাদারের গাড়ির কথা এখানে ফোন ক'রে জানায়—এখানে আগেই নজর রেখেছিল, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পায় নি। অর্থাৎ ইউ ওয়ার লস্ট!···আপনি হেরে গেলেন কিন্তু আপনার নির্দেশ হারে নি। আপনি বলেছিলেন নলিনাক্ষবাবুর ওপর নজর রাখতে, আমরা ফেথফুলি সে নির্দেশ পালন করেছি। তাতেই —ওঁর এ-পাড়ায় য়্যামেচার গোয়েন্দাগিরির চেষ্টা, সন্ধ্যাবেলা সোলেমানের হাতে ধরা পড়া—সব খবরই পেয়েছি। যে পিছু নিয়েছিল সে একা, সে যখন খবর দিলে তখনও আমরা এখানে এ বাড়িতে এসে হানা দিতে সাহস করি নি, যদি খুন ক'রে গুম্ ক'রে দেয় ধরা পড়ার ভয়ে। তক্কে তক্কে ছিলাম, সোলেমান শেষ রাত্রে ওখান থেকে বেরিয়ে ওর মেয়েমানুষের বাড়ি যাচ্ছিল, সেখান থেকে অতর্কিতে তাকে গাড়িতে তুলে নিয়েছি। রাত চারটের সময় জনমানব নেই, কেউ দেখে নি।'

'বাহবা! ঠিক করেছ। তার পর?'

'তার পর সোলেমানকে নিয়ে পড়া। সে কি সোজা, ভেরী হার্ড নাট টু ক্র্যাক। তখন দাদা, এই বড়সাহেবরা আছেন তাঁদেরও জানাচ্ছি,

আমার চাকরিটা খাবেন না—উপায় ছিল না দেখেই থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করলুম। তাও একটুতে হয় নি, লোকটার কি অসীম সহ্যগুণ কী বলব, শেষে যখন কুড়ি আঙ্‌লে কুড়িটা পিন ফুটিয়ে বুকে বাঁশ দিয়ে ডলছি—কম্বলের ওপর দিয়ে অবিশ্যি, এই মোহন হাতটা একটু একটু ক'রে মোচড়াচ্ছে, তখন কাজ হল। সবই বলল। কিন্তু এই করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে গেছে, যখন শুনলুম সমস্ত মাল ওরা আজই পাচার করবে, ছুটো রোডওয়েজের লরীতে পুরে চট চাপা দিয়ে নিয়ে যাবে ভাইজাগ, মানে তাই বলে বেরোবে, তার আগেই—এদিকে জাহাজ রেডী আছে, এখান থেকে সে মাল নিয়ে ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করবে মোহানায়—এরা লরী থেকে নৌকোয় চাপিয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে তুলবে, তখন একটু অপেক্ষা করাই ঠিক বিবেচনা করলুম। এতক্ষণই গেছে, একটুতে কি এসে যাবে! ওদের মাল পেরিয়ে গিয়ে রোডওয়েজের লরীতে উঠেছে, ছুটো লরীতে এদের লোক, পিছনে মঞ্জুর মিঞা একটা ট্যাক্সিতে—ঠিক জায়গা বুঝে আমরা ঘিরে ধরেছি। তাই কি পারতুম, আমাদের এস. আই. আমেদ—সে বুদ্ধি ক'রে রাইফেল চালিয়ে আগেই চাকাগুলো ফুটো ক'রে দিয়েছিল তাই। সে সব ব্যবস্থা ক'রে এখানে আসছি—'

'ছেলেমেয়েগুলো?' সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে নলিনাক্ষ।

'সেফ অ্যাণ্ড সাউণ্ড। তবে সে পর্যন্ত থাকতে পারি নি, এখানে ছুটে এসেছি। অবশ্য একটু আগেই ফোন পেলুম, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বেশির ভাগই বেঁচে যাবে।'

তার পরই প্রবীর বলল, 'কিন্তু নলিনীদা, এর মধ্যে একটু রোম্যান্সও আছে। আপনারই ভাগ্য।'

'কী রকম? কী রকম?' দেবীপদও ঝুঁকে পড়ে।

'আজই সন্ধ্যার পর একটি নারীহস্তের চিরকুট আমাদের কমিশনার সাহেবের ঘরে পৌঁছয়, তাতে এই বাড়ির ঠিকানা দিয়ে লেখা আছে—নলিনাক্ষবাবু এখানে মাটির নিচের ঘরে মৃত্যুমুখে—এখনই যেন তাঁকে উদ্ধার করা হয়।'

'তাই নাকি? কিন্তু সে আবার কে?' নলিনাক্ষ বিহ্বল হয়ে পড়ে, 'যাঃ! তুমি ঠাট্টা করছ!'

'না না,' কমিশনার বলে ওঠেন, 'ঠিকই বলেছে। সে চিঠি আছে। কাল দেখবেন, হাতের লেখা যদি চিনতে পারেন। তবে আমার যা সারমাইজ—যা শুনলুম সব কেসটা—পরেশ চাকলাদারের মেয়েই হবে।'

পরেশ চাকলাদারের মেয়ে? শাখী?

শাখী খবর দিয়েছে?

শাখী?

শাখী, নলিনাক্ষকে—নিজের বাবার শত্রুকে—বাঁচাবার জন্যে পুলিসে চিঠি দিয়েছে।

না না, সে কেমন করে হবে।

এ যে অসম্ভব।

অথচ এঁরাও যে ভাবে বলছেন, তামাশা বলেও তো মনে হচ্ছে না।

কিন্তু কেন? কী তার এত গরজ?

আবারও যেন মাথা গুলিয়ে যায় নলিনাক্ষর। আবার সেই যন্ত্রণাটা চাড়া দিয়ে ওঠে। আর সেই যন্ত্রণা ও বিহ্বলতার মধ্যেই মন মনের ভেতর হাতড়ে বেড়ায়, কারণটার সূত্র খুঁজতে চেষ্টা করে। ধাঁধা বা হেঁয়ালির মতো দেখতে দেখতে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে রহস্যটা—ক্রশ-ওয়ার্ড পাজ্‌ল্‌-এর সূত্রের মতো অস্বস্তিকর। কোথায় যেন সমাধানের একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে, অথচ ঠিক ধরা যাচ্ছে না, সেই রকম।

এ কাজ যে জন্যে করে মেয়েরা—কৈ শাখীর সঙ্গে ওর তো তেমন কোন রোম্যান্সের—প্রেম তো দূরে থাক, অনুরাগেরও সম্বন্ধ ছিল না! কোন পূর্বরাগের ভূমিকা-মাত্রও দেখা দেয় নি।

অন্তত নলিনাক্ষর তরফে দেয় নি।

তবে—এখন যা একটু একটু মনে পড়ছে—দু-একদিন শাখীর

আচরণটা ওর কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেছে।

একদিন নিজেই এসেছিল সে, সে-ই প্রথম; বৌদির কাছে বোনার প্যাটার্ন-বই চাইতে। বৌদি সাধারণ ভাবে, সোয়েটার ইত্যাদি বোনেন বটে কিন্তু তাঁর কাছে কোন বই নেই, এমন কিছু অসামান্য কারিগরও নন। এ আসাতে তিনি খুশীও হন নি, তাঁর নিজেরই ভাষায়—'বড়লোকের মেয়ে, ঐশ্বয্যি দেখাতে আসা! হাড়পিত্তি জ্বালা করে। তা নয়—জঁাকের গল্প যেমন মা ক'রে যায়, তেমনি ওরও করবার লোক চাই তো! কিংবা ছুতো ক'রে খবর নিতে আসা, আমরা গরিব মানুষরা কেমন খাই দাই—'

এ সবই বৌদির রাগের কথা।

তবে ছুতোর কথাটা সত্যি। সেটা বোঝা গিছল দিন সাতেক পরেই।

বৌদিই নিয়ে ওপরে উঠেছিলেন, ওর ঘরে ঢুকে বলেছিলেন, 'ঠাকুরপো, এই সামনের বাড়ির পরেশবাবুর মেয়ে এসেছে একটু, তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'আমার সঙ্গে ? কেন ?

একটু বোধ করি রূঢ়ই শুনিয়েছিল নলিনাক্ষর গলা। সে তখন সবে কাগজ কলম নিয়ে একটা গল্প ফেঁদে বসেছে—এই অকারণ ব্যাঘাতে বিরক্ত হয়ে উঠবে—সে তো স্বাভাবিক।

'নাও, অত মেজাজ দেখাতে হবে না (বৌদি বিবেচনা বুদ্ধির—যাকে 'ট্যাক্‌ট্‌' বলে ইংরেজিতে—কিছু মাত্র ধার ধারেন না), ঢের লেখক হয়েছ! এও লেখে, ওর ইচ্ছে তুমি ওর দু-একটা লেখা একটু দেখে দাও। এখন না পারো, রেখে দাও, ধীরেসুস্থে দেখে দিও।'

লাল হয়ে উঠেছিল শাখী, ঘেমে উঠেছিল সেই হেমন্তের দিনেও। হাত কাঁপছিল থর থর করে—লেখাটা টেবিলে রাখার সময় সেটাও নজরে পড়েছে। কিন্তু তার ভেতরও অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পায় নি, নবীন লেখকের সহজ লজ্জা, বলে ধরে নিয়েছে। বিশেষ অল্প বয়সী মেয়ের পক্ষে এ একটা নিদারুণ অবস্থা বৈকি!

লেখা কিছুই হয় নি, দেখে মনে হচ্ছে সে সম্বন্ধে ধারণাও খুব স্পষ্ট নয় মেয়েটার। কিন্তু সে কথা বলাও কঠিন। তাই ক'দিন পরে যখন লেখার খবর নিতে এসেছে তখন মিষ্টি ক'রে অনেক ঘুরিয়ে বলতে হয়েছে, দু-একটা মামুলি উপদেশও দিতে হয়েছে।

তবে সেই সময়ই লক্ষ্য করেছে নলিনাক্ষ—ব্যর্থতাটা সহজেই মেনে নিয়েছে মেয়েটা এবং তখনই উঠে পালাবার চেষ্টা করে নি। একথা সেকথার পর হঠাৎই অত্যন্ত ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন করেছে, 'আপনি বুঝি রোজ ব্যায়াম করেন?'

চমকে উঠেছে নলিনাক্ষ, ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করেছে, 'আপনি কি ক'রে জানলেন? কেউ বলেছে? বৌদি বুঝি?'

'না না। কেউ বলে নি। আমাদের ছাদের ঐ কোণটা থেকে আপনার ঘরটা দেখা যায় যে একটু একটু। তাতেই—। এতে কিছু দোষ আছে নাকি?'

'না দোষ নেই। তবে এ দেখার বা এ নিয়ে আলোচনা করারই বা কি আছে, বিশেষ খালি হাতে করা—।'

'দেখার আছে বৈকি। দেখেন নি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিকেলে ব্যায়াম সমিতির ছেলেরা যখন ব্যায়াম করে কী রকম ভীড় জমে যায়। সুগঠিত দেহ তো খুব সুলভ নয়।'

এই পর্যন্তই।

সেদিন তখনই চলে গিছল। আর আসে নি। তবে দেখার ব্যাপারটা পরেও লক্ষ্য করেছে। ছাদ নয়, চিলেকোঠার ঘর থেকেই দেখে, দূরবীন দিয়ে। বিরক্ত হয়ে জানলা বন্ধ ক'রে ব্যায়াম করেছে তার পর থেকে।

এর পর দু-একদিন পাড়ায় কোন কোন ক্রিয়াকর্ম-বাড়িতে দেখা হয়েছে, ওদের বাড়িতেও এসেছে, দু-একবার। তবে অন্তরঙ্গ হবার কোন চেষ্টা করে নি বিশেষ, হয়ত নলিনাক্ষর কঠিন অনমনীয় ভাব-ভঙ্গি দেখেই সাহস হয় নি। শুধু একদিন, ওদের পুরী যাবার আগে পথে একদিন দেখা হয়েছিল—হাঁটতে হাঁটতেই আসছিল, নলিনাক্ষও

বাকী সামান্য পথটুকু পাশে পাশে এসেছিল, কতকটা বাধ্য হয়েই।

সেই সময়ই একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিল, 'আচ্ছা নলিনদা, বাইবেলে আছে শুনেছি, "সিন্‌স্‌ অফ দি ফাদার্স উইল ভিজিট টু দেয়ার চিলড্রেন"—ঠিক হয়ত বলতে পারছি না, এই রকমই কথাটা—আপনি তো জানেন—কিন্তু কেন? বাপ যদি পাপ করে সে জন্যে ছেলেমেয়েরা দায়ী হবে কেন? কেন তাদের সেই ভাবে বিচার করা হবে? আমাদের শাস্ত্রে তো একথা বলে না, রত্নাকরের মা বাপ স্ত্রী পুত্র তো সাফ জবাব দিয়েছিল, আমরা কি জানি তুমি কোথা থেকে কী ভাবে রোজগার করছ! তবে কেন আমাদের সমাজ বাপ মায়ের কাজ দেখে ছেলেমেয়েদের বিচার করবে!'

বিস্মিত হয়েছিল নলিনাক্ষ ওর উত্তেজনা দেখে। শুধু তাই নয়—মেয়েটা যে এত লেখাপড়া করে, এত ভাবে—তা দেখেও। ওদের বাড়ির পক্ষে যেন এটা বেমানান। সে উত্তর দিয়েছিল, 'না, বাইবেলের ও কথাটার মানে এ নয় যে তাদের দায়ী করা হয়—ওর অর্থ এই যে, বাপ-মায়ের পাপের ফল এদের ওপরও এসে পড়বে খানিকটা, এদের ভুগতে হবে।...সামাজিক ধিক্কার—সেও সেই ভোগারই অঙ্গ একটা, নয় কি।'

আর কিছু বলে নি শাখী, মুখটা যেন অন্য দিকে ফিরিয়ে নিঃশব্দেই হেঁটে ছিল বাকী পথটুকু—অবশ্য পথও বিশেষ আর বাকী ছিল না তখন।

আজ মনে হচ্ছে কে জানে, হয়ত বা চোখে জল এসে গিয়েছিল মেয়েটার, সেটা চাপতেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল।

এর পর পুরীতে দেখা হয়েছে এক আধ বার। সাধারণ স্বাভাবিক ভাবেই কথাবার্তা হয়েছে। সকলের সামনেই। কেবল একদিন মাত্র মিনিট খানেকের জন্যে নির্জনে দেখা হয়েছিল। সন্ধ্যার সময়, নলিনাক্ষদের বাসার সামনেই, একা দাঁড়িয়েছিল, মনে হ'ল সেখান থেকেই বেরিয়ে আসছিল, ওকে দেখে দাঁড়িয়ে গিছল—যদিচ এখন মনে হচ্ছে ইচ্ছে ক'রেই, ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল—বলে উঠেছিল,

চাপা কেমন এক রকমের ভাঙা গলায়—'রাত্রে বেরোন কেন সমুদ্রের ধারে? অন্ধকারে একা যাওয়া বড় বাহাদুরী—না? বালির মধ্যে কত কী থাকতে পারে? জানেন এখানে খুব বিষাক্ত সাপ আছে, সন্ধ্যের পর তারা বেরোয়?'

নলিনাক্ষ বিস্মিত হয়ে জবাব দিয়েছিল, 'সাপ! কৈ শুনি নি তো। তাছাড়া আমি তো আলো নিয়ে যাই। আর ঐ একদিনই তো—'

কিন্তু সে উত্তর নেবার জন্যে বোধ হয় শাখী অপেক্ষা করে নি—কারণ, বলতে বলতেই নলিনাক্ষ লক্ষ্য করেছিল, সে শূন্যকে উদ্দেশ ক'রেই বলছে, তার সামনে কেউ কোথাও নেই আর। যেন অন্ধকারেই মিলিয়ে গেছে শাখী।

মন নিমেষে বহু দূর পৌঁছে যায়। এত দ্রুত গতি আলোরও নয়!

সমস্তটা ভেবে নিতে বোধ হয় এক মিনিটও লাগে নি। ফিল্মের চেয়ে অনেক দ্রুত ছবিগুলো সরে সরে গেছে স্মৃতির পর্দায়।

তার মধ্যেই কানে গেল, প্রবীর বলছে, 'বাই দ্য বাই, দেবীদা, আর একটি স্টার্টলিং নিউজ অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে, পরেশ চাকলাদার খুন হয়েছে।'

'য়্যাঁ!' দুজনেই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল—দেবীপদ ও নলিনাক্ষ। 'সে তো হাজতে ছিল!'

'হ্যাঁ। হাজতেই খুন হয়েছে। এই একটু আগে খবর পেয়েছি।'

'খুন না আত্মহত্যা?'

'খুনই তো শুনছি। এখনই যাচ্ছি আমরা। আপনাদের উদ্ধার করাটা আগে দরকার বলে এখানেই এসেছি। এবার আপনারা বাড়ি গিয়ে বিশ্রামের চেষ্টা করুন—আমরা ওখানে যাই।'

দেবীপদ বলল, 'আমার বিশ্রাম লাগবে না। চলো, আমিও যাচ্ছি।'

শ্রান্ত নলিনাক্ষ চোখ বুজেই শুধু বলে দিল, 'মেয়েটার দিকেও একটু নজর রেখো দেবীপদ। সেও না আত্মহত্যা ক'রে বসে। কিম্বা পারো তো কোন নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে দাও।'

'সে আমারও মনে হয়েছে।' যেতে যেতেই উত্তর দিল দেবীপদ।